মে 1987

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

বাংলায় প্রকাশিত প্রথম ক্যুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations
—*The Statesman*

আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

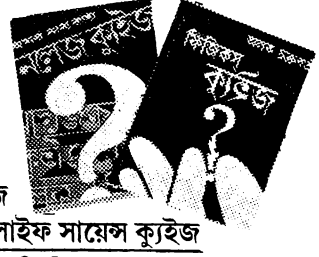

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ ক্যুইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স ক্যুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত ক্যুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ

প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র ঃ 4 কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর ঃ আত্মরক্ষায় রসায়ন ॥ সমরজিৎ কর 7

কল্পবিজ্ঞানের গল্প ঃ যাদুখড়ি ॥ শৈবাল চক্রবর্তী 31

অনুবাদ গল্প ঃ অস্ত্র ॥ রাজা রায় 47

বিশেষ রচনা ঃ জাতিঙ্গার পাখি ॥ অজয় হোম 19

পড়াশোনা ঃ মৌল পরিচিতি—হাইড্রোজেন ॥ অমরনাথ রায় 15

জ্ঞান বিজ্ঞানের রচনা ঃ বিজ্ঞানীদের টুকিটাকি ॥ অমরনাথ রায় 18 বিজ্ঞান সংবাদ 52 অক্সিজেন নিয়ে বিভ্রাট ॥ কৌশিক ভট্টাচার্য 54 ঃ ইলেকট্রনিকস্-এর কলাকৌশল ॥ বিপ্লব ব্যানার্জী 27 ঃ সমুদ্র সম্পদ ॥ জয়দেব শেঠ 40 ঃ যোগে সুস্বাস্থ্য ॥ মলয় রায় 42 ঃ জানা অজানা—বিচিত্র সংবাদ ॥ শুভাশিস ঘোষ 29 ঃ প্রতিযোগিতার খবর 34 ঃ বিজ্ঞানের খবর ॥ অমিত চক্রবর্তী 66 ঃ মহাবিশ্বকে আমরা যেমন দেখি ॥ মৃণ্ময়ী দাস 49

জীবজন্তু ঃ গিরগিটি ॥ ধীরেন দত্ত 39 ঃ ডুগং ॥ অমরনাথ রায় 22

ছড়া ঃ তপোময় ঘোষ 33 ঃ

গাছপালা ঃ পানিফল ॥ অসীম হালদার 30 ঃ চেনা অচেনা ফুল ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 14

ধারাবাহিক রচনা ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 35 বিজ্ঞানের ডায়েরী ॥ বিমান বসু 9

আবিষ্কারের গল্প ঃ অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ 58

ছবিতে গল্প ঃ প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 11 ঃ আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার 12 ঃ বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 55 ঃ খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 ঃ ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43 ঃ

ছোটদের দপ্তর ঃ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের খবর 59 ঃ সফল উত্তরদাতাদের নাম 59 ঃ অটোগ্রাফ সহ গ্রন্থ উপহার 59 ঃ ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1 2 3 ॥ 56 ঃ শব্দকূট ॥ বিপুল আচার্য 57 ঃ সমাধান 57 ঃ ফায়ার অ্যালার্ম ॥ ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় 61 ঃ জলে চলে ব্লেড ॥ অপরাজিত বসু 62 ঃ বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 63 ঃ

সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা
মে, 1987

আগামী সংখ্যায়

অনাদিনাথ দাঁ
ও
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের
বিশেষ রচনা

মহাকাশে যোগাযোগ
ব্যবস্থা
ভেইনু বাপু টেলিস্কোপ

প্রধান সম্পাদক ॥ সমরজিৎ কর
সম্পাদক ॥ রবীন বল
সহ-সম্পাদক ॥ জয়ন্ত দত্ত

প্রচ্ছদ ঃ অলয় ঘোষাল ॥
অন্যান্য ছবি ঃ অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল ॥

চিঠিপত্র

ইউক্লিডের জ্যামিতি ভুল প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা

মার্চ সংখ্যায় 'পড়াশোনা' বিভাগের একটি লেখা 'ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রসঙ্গে'-তে দশম শ্রেণীর ছাত্র ইন্দ্রনীল ঘোষ তার একটি সমস্যার কথা জানিয়েছে। সেই বিষয়ে লিখছি।

ইন্দ্রনীল ওর problem-এর বিভিন্ন ধাপ অনেকটা পর্যন্ত ঠিকই করেছে। কিন্তু শেষের আগের ধাপে ভুল করে ফেলেছে। ও একটি অসমীকরণের দুই পাশ থেকে আর একটি অসমীকরণের দুই পাশ বিয়োগ করেছে এবং অসমীকরণ চিহ্ন অপরিবর্তিত রেখেছে। এখানেই ভুল হয়ে গেছে।

আমরা জানি একটি সমীকরণের দুই পাশ থেকে আমরা একটি সমীকরণের দুই পাশ বিয়োগ দিতে পারি। সমীকরণ চিহ্ন ঠিক থাকে।

$a=b,\ c=d \quad \therefore \quad (a-c)=(b-d)$

এমনকি একটি অসমীকরণের দুই পাশ থেকেও আর একটি সমীকরণের দুই পাশ বিয়োগ করতে পারি। অসমীকরণ চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকে।

$a>b,\ c=d,\ (a-c)>(b-d)$

কিন্তু ইন্দ্রনীল যা করেছে (পূর্বে উল্লেখ করেছি) তাতে অসমীকরণ চিহ্ন যে একই থাকবে তার কোন মানে নেই, পরিবর্তিত হতেও পারে। আবার নাও হতে পারে, এক্ষেত্রে সেটি সমীকরণ চিহ্ন হয়ে যাবে।

$a>b,\ c>d$ মানেই $(a-c)>(c-d)$ নয়।

পাটীগণিতের সাহায্যে একটি উদাহরণ দিলেই ইন্দ্রনীল ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। $10>9,\ 8>3$

তার মানে কি $(10-8)>(9-3)$ বা, $2>6$?

তাই এক্ষেত্রে $\angle BDC>\angle BAC$ বরং $\angle BDC=\angle BAC$

যা ইউক্লিডের জ্যামিতি বলে।

শতভিষা সরকার

(দ্বিতীয় বর্ষ, সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণী—ভূবিদ্যা, যোগমায়া দেবী কলেজ)

মার্চ '87 সংখ্যায় ইন্দ্রনীল ঘোষ ইউক্লিডের জ্যামিতি দিয়েই তার উপপাদ্য ভ্রান্ত প্রমাণ করতে গিয়ে গোড়ায় গলদ করে ফেলেছেন। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। আমরা পাটীগণিতের সাধারণ ধারণা থেকেই জানি যে, $90>80$ এবং $30>5$, তার মানে এই নয় যে :—

$90-30>80-5$ অর্থাৎ $a>b$ হলে

$(a-c)>(b-d)$ হওয়া তখনই সম্ভব, যদি $c=d$ হয়

আমার সীমিত গণিতের জ্ঞানে এইটুকু বলতে পারি যে, পাটীগণিত তথা বীজগণিতের এই সাধারণ ধারণা পরিস্ফুট করলেই তাঁর প্রমাণের ভুল প্রমাণিত হবে। তাঁর প্রদত্ত উদাহরণে।

$\angle BDC>\angle BAC$—হওয়া তখনই সম্ভব

যদি, $\angle CDO=\angle CAD$ হয়,

অথবা $\angle CAD>\angle CDO$ হয় (এক্ষেত্রে)।

কিন্তু, তা অসম্ভব। সুতরাং, তাঁর প্রমাণটির যথার্থতাও অসম্ভব॥

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী-(87) বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়

পড়াশোনা

'পদার্থের অবস্থান্তর পরিবর্তন ও রাসায়নিক সমীকরণ' সম্পর্কিত বিবেক রায় মহাশয়ের রচনাটি বেশ ভালো লাগল তবে সেইসঙ্গে লেখকের (বা ছাপাখানার) একটি ভুল চোখে পড়ল। তিনি লিখেছেন, "জিঙ্ক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় জিঙ্ক সালফেট ও হাইড্রোজেন," কিন্তু তারপর তিনি রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সমীকরণ লিখেছেন $H_2S_4+Z_n=Z_nSO_4+H_2$ কিন্তু এই রাসায়নিক সমীকরণটি ঠিক নয়। কারণ সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্কেত H_2S_4 নয়, এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্কেত H_2S_4 হলে জিঙ্ক সালফেট লবণ হত না, কারণ Z_nSO_4-এর অক্সিজেন বিক্রিয়কদ্বয়ে নেই। সুতরাং সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্কেত হবে H_2SO_4 এবং রাসায়নিক সমীকরণটি হবে $_2HSO_4+Z_n=Z_nSO_4+H_2$।

এই বিষয়ে আরও চিঠি লিখেছেন **মিতালি বসু**, শেওড়াফুলি, হুগলী। **পিনাকী চক্রবর্তী**, পর্বতপুর বর্ধমান। **শ্রীছন্দোময় মণ্ডল**, বি 15/77 লেক প্লেস কল্যাণী, নদীয়া।

প্রথম আকাশে ওড়া

1986 সালের মার্চ মাসের কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে বিমল বসুর লেখা 'দূর আকাশের হাতছানি' নামক গল্পের বিশেষ কয়েকটি কথা উপস্থাপন করছি।

তাঁর গল্পের একটি লাইন (34 পৃষ্ঠার প্রথম কলমের প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষ লাইনে) (মানুষের আকাশ..... .....সেই থেকেই।) আমি উল্লেখ করছি। লেখকের এই মন্তব্যটি আমি ভুল বলে মত প্রকাশ করছি। কারণ—

(1) *এর আগে বেলুন, গ্লাইডার প্রভৃতি মহাকাশ বা আকাশ পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে।*

"ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রসঙ্গে" রচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'ইউক্লিড ভুল করেন নি'—এই বক্তব্যের সমর্থনে আরও যাঁরা চিঠি পাঠিয়েছেন :

1. বারিদ বরণ উথাসনী, সন্দীপ মাহাত ও তন্ময় চক্রবর্তী (দশম), কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশন, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। 2. শ্যামশঙ্কর রায়, লোগো, বাঁকুড়া। 3. তপনকুমার বসাক (দশম) ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন, পোঃ-ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া। 4. তাপসকুমার পাল, শম্ভুনাথ কলেজ হস্টেল, লাভপুর, বীরভূম। 5. বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী, মেদিনীপুর-1। 6. শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী। 7. পার্থপ্রতিম লাহা (দশম) দেয়াসা আলিগ্রাম বি. এস. ইউ বিদ্যালয়, বর্দ্ধমান। 8. প্রতীক চন্দ, ফুলবনী হাইস্কুল, বেনাডিহা, মেদিনীপুর। 9. ঝিল্লি চক্রবর্তী, বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়, ভবানীপুর কলকাতা। 10. উজ্জ্বল আচার্য, দিনহাটা, কোচবিহার। 11 তরুণকুমার সিংহ, কাশেমনগর বর্দ্ধমান। 12. রামগোপাল নাথ, সল্টলেক, কলকাতা-64। 13. নবেন্দু চক্রবর্তী, (দশম) স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন, কলকাতা 82। 14. প্রেমা ষি ভট্টাচার্য, (দশম) ইছাপুর শ্রীগদাধর বিদ্যালয়, বর্ধমান। 15 মিলন মুখার্জী, (একাদশ শ্রেণী), হেয়ার স্কুল, কলকাতা। 16. মিলন মুখার্জী, (একাদশ শ্রেণী,) শান্তিপুর নদীয়া। 17. দিলীপ ভৌমিক, কুলগাছিয়া, হাওড়া। 18. সুজিৎকুমার শাসমল, গঙ্গা, হাওড়া। 19. গৌতম ঘোষ, রাঙাবালী, মুর্শিদাবাদ। 20. অমিত দত্ত, (একাদশ) হেয়ার স্কুল, কলকাতা, 21. চন্দন দাস (দশম), কলকাতা-54। 22. অতনু দাস, অজিতেশ মিত্র, অপূর্ব সরকার' ঋত্বিক গুহ (দশম), ইন্দা, খড়্গপুর। 23. প্রদীপ গরাই (দশম) কাশীরাম দাস রোড, বয়েজ স্কুল, দুর্গাপুর 5, বর্দ্ধমান। 24. বিমান রায়, পানিহাটী, 24 পরগনা। 25. সত্যব্রত ঘোষ, দমদম রোড, কলকাতা-2। 26. রাজীব পোদ্দার, হিন্দুস্কুল, কলকাতা। 27. প্রসূন সিনহা, রামকৃষ্ণমিশন বালকাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, রহড়া 24 পরগনা। 28. দেবকল্যাণ পাল, প্রতাপ-বাগান বাঁকুড়া। 29. স্মৃতিকণ্ঠ ব্যানার্জী (দশম), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অমৃত বিদ্যালয়। 30 অমৃত ঘোষ (নবম), সোদপুর উচ্চবিদ্যালয় 24 পরগনা। 31. প্রতিমা সেনগুপ্তা (দশম), বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা-31। 32. চন্দ্রা মুখার্জী, লেক টাউন গভঃ স্পনসর্ড গার্লস স্কুল, কল-74। 33. বিপ্লব দাস, ডোমজুড়, হাওড়া। 34. অশোক ঘোষ ও অরিজিৎ চন্দ, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন, বালকাশ্রম, 24 পরগনা। 35. রাতুল গোস্বামী (দশম), মালডাঙ্গা রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যামন্দির, বর্দ্ধমান। 36. সমিত ভৌমিক (দশম), আনারা এস ই রেলওয়ে এইচ এস স্কুল, আনারা, পুরুলিয়া! 37 বিপ্লব মণ্ডল (দশম), হাবড়া হাইস্কুল, 24 পরগনা। 38. বিনয় সাহা, কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যামন্দির কল-55। 39. শঙ্খপ্রতিম ভট্টাচার্য (দশম); দঃ পূঃ রেলওয়ে উচ্চমাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়, খড়্গপুর, মেদিনীপুর। 40. দেবাশিষ হাজরা চৌধুরী (দশম), বালীগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, কলকাতা। 41. অরিন্দম মজুমদার, জয়ন্ত লোহ চৌধুরী (দশম), হার্নেট হাইস্কুল, কাঁচড়াপাড়া। 42. মলয় ভদ্র, বাঙ্গুর মালটি পারপাস বয়েজ হাইস্কুল, কল-55। 43. ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী (দশম), হেয়ার স্কুল, কলকাতা-73। 44. নীলাদ্রি শেখর রায় বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা। 45. সুরজিত কুমার প্রামাণিক, মাকড়দহ রমাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন, হাওড়া। 46. বিজয় চট্টোপাট্যায়, গুপ্তিপাড়া হুগলী। 57. গৌরীশংকর পণ্ডা, কেদারপুর রামনন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, কেদারপুর, হাওড়া। 48. কল্লোল ভট্টাচার্য (দশম), হুগলী স্কুল, হুগলী। 49. অমিতাভ

(2) সর্বপ্রথম বিমান ওড়ানোর (যা প্রপেলার নামক যন্ত্রাংশের সাহায্যে ওড়ানো হয়েছিল) তারিখ 1903 খ্রীস্টাব্দের 17ই অক্টোবর নয়। কারণ, শ্রী মদনমোহন তা মহাশয়ের লেখা বিজ্ঞান পরিচয়' নামক গ্রন্থে ঐ তারিখটা 1903 সালের 27শে ডিসেম্বর উল্লেখ করা আছে।

(3) লেখক ঐ ভুল মন্তব্য করার আগেও অন্যান্য অংশে বলেছেন বেলুন ও গ্লাইডার নামক আকাশ যানের কথা। তবে আমার আলোচিত বাক্যটি কি যুক্তি তর্কের দিক থেকে, তাঁর পক্ষে উল্লেখ করা একটু ভুল হল না ?

ভাস্কর চক্রবর্তী, গ্রাম + পোঃ—হরিশপুর ভায়া + থানা—গোসাবা, জেলা 24 পরগণা। পিন—743570

বাংলা দেশে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার গ্রাহক হবার ঠিকানা

সম্পাদক : বিজ্ঞান বার্তা

পোস্ট বক্স : 553

ফোন : 207987

প্রসঙ্গ : ইলেক্ট্রনিক্স

আমরা আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মিত গ্রাহক এবং পাঠক। সত্যি বলতে কি এই পত্রিকাটি বিশেষত ইলেকট্রনিক্স বিভাগটি আমাদের খুবই প্রিয়। তবে এই বিভাগটি আমা দর মনের পুরো চাহিদা মেটাতে পারে না।

আপনাদের এই বিভাগে বহু ইলেকট্রনিক্স প্রজেক্ট প্রকাশিত হয়। আমরা সেগুলি নিজেরা তৈরী করে প্রভূত আনন্দ লাভ করি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন ঠিক পুরোপুরি জ্ঞানলাভ

চৌধুরী, হাটকৃষ্ণপুর, বাঁকুড়া। 50. নিসার আহম্মদ সরকার, খাজুরদহ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হুগলী। 51. শান্তনু চৌধুরী, (দশম), টাকী হাউস বয়েজ স্কুল, কলকাতা-9। 52. আসিফ মেহেববু, অবিনাশপুর, বীরভূম। 53. জগদীশ চন্দ্র, শান্তিপুর নদীয়া। 54. সুরজিৎ সিমলাই, জনাই, হুগলী। 55. অরিন্দম রায়, বনহুগলী হাইস্কুল, কল-35। 56. অনুব্রতী মুখার্জী, আই আই টি কোয়াটার, খড়্গপুর। 57. সমীরণ পাল (একাদশ), ব্যানার্জীগঞ্জ হাইস্কুল, মেদিনীপুর। 58. চন্দনকুমার মণ্ডল, শ্যামপুর হাইস্কুল, হাওড়া। 59. অভীক ও আশীষ চক্রবর্তী, 264 টাকি রোড, কাজিপাড়া, 23 পরগনা। 60. সত্যরঞ্জন দাস (দর্শন) অমশি রঘুনাথ হাইস্কুল, মেদিনীপুর। 61. অসীম পাল, (দশম) বেজিয়া, বাঁকুড়া। 62. সুমন্ত মুখার্জী, দুর্গাপুর 5, বর্দ্ধমান। 63. মণ্ডমণি ঘটক (দশম), বৈষ্ণবচক মহেশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়। 64. ফটিকচন্দ্র মাইতি (শিক্ষক) বাঙালপুর ইউ সি হাইস্কুল হাওড়া। 65. শেখ আশাদুল হক (দশম) মুগকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া। 66 জয়ন্ত মল্লিক (দশম), এ. বি. এল টাউনশিপ দুর্গাপুর-6। 67. রাজীবদাস মহাপাত্র, মেদিনীপুর। 68. শিবব্রত দাশগুপ্ত, এস ই রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খড়্গপুর। 69. তমাল কুমার রাহা, ও জোন বয়েজ এম পি স্কুল, দুর্গাপুর-4। 70. চিরদীপ নিয়োগী, (দশম) পুইনান হাইস্কুল, হুগলী। 71. অনিন্দ্য চৌরুরী, বাঘাযতীন পল্লী কল-32। 72. কাকলি সাহা, গ্রাম্য হিতকারী বালিকা বিদ্যালয়, আন্দুল মৌরী, হাওড়া। 73. অজন্তা দে সরকার, তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া। 74. শমিতা ভট্টাচার্য, বেলুড়মঠ, হাওড়া। 75. সৌমেন ভট্টাচার্য, নবকৃষ্ণ পাল আদর্শ শিক্ষায়তন। 76. শাশ্বতী মাইতি (দশম), অতুলমণি গার্লাস হাইস্কুল, মেদিনীপুর। 77. দেবাজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কৈলাসবাবু লেন, হাওড়া-1। 78. দেবশ্রী মজুমদার, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কল-54। 79. দেবাজিৎ চ্যাটার্জী। কৈলাস বোস লেন, কলকাতা। 80. সুতীর্থ পাল, আমলাপাড়া মাথাভাঙা, কুচবিহার। 81. সুপ্রতীপ মজুমদার (দশম) চিলড্রেনস ওন হোম উত্তরপাড়া, হুগলী। 82. সুচিত্র সিংহ রায়, আগাপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় বর্দ্ধমান। 83, অজিত দাস কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ, মেদিনীপুর। 84. সীমান্ত মজুমদার (নবম শ্রেণী) হেতমপুর হাইস্কুল, বীরভূম। 85. তাইজুল ইসলাম, শ্রীপৎ সিং কলেজ, মুর্শিদাবাদ। 86. হেমন্ত মণ্ডল, বহড়াল, বর্দ্ধমান। 87. প্রবুদ্ধ সিংহ ঠাকুর, জয়দেব হাইস্কুল, দুর্গাপুর 5। 88. প্রদীপ কুমার বসু (IX) মন্মথনাথ হাইস্কুল, নোনা চন্দন পুকুর, ব্যারাকপুর। 89. জয়ন্ত মিত্র, গোবর-ডাঙা, 24 পরগনা। 90. শ্বাশ্বত বর্মা। পোঃ জি জলপাইগুড়ি। 91. তাপস রায়, চম্পাহাটী জেঃ 24 পরগনা,। 92. কমল সেন নবেন্দ্রপল্লী. চাকদহ নদীয়া। 92 রাধাশ্যাম মাইতি দেপাল, মেদিনীপুব। 93. তপন মণ্ডল। পোঃ বুকনী, জেঃ পুরুলিয়া। 94. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, 33 এসবি রোড, কল-56

[পত্রিকার মুদ্রণকার্য চলাকালীন আরও অনেক চিঠি এই প্রসঙ্গে এসেছে, তাঁদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের সজাগ পাঠকদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। —সম্পাদক]

করতে পারি না। যেমন ধরুন, আপনাদের যে কোন একটি প্রজেক্টে কিছু ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপ্যাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও আমরা সেই প্রজেক্টে যন্ত্রপাতিগুলি ব্যবহার করলাম কিন্তু তার আসল ক্ষমতাগুলি এবং তার প্রকৃত প্রয়োগ কৌশলগুলি অজ্ঞাত থেকে গেল।

কিন্তু আপনারা যদি এই বিভাগ-নিম্নলিখিত ভাবে গড়ে তোলেন তবে আমাদের চাহিদা পূর্ণ হবে।

যেমনঃ প্রথমে ধরা যাক Transistor, এটাকে চেনালেন। যন্ত্রটির একটি ক্ষমতা হল সুইচিং করা। আপনারা transistor-এর এই ক্ষমতা-টাকে শেখাবার উদ্দেশ্যে একটি প্রজেক্ট তৈরী করে দেখালেন। তারপর এর আর একটি ক্ষমতাকে নিয়ে এই ভাবে হাতে কলমে শেখালে ইলেকট্রনিক্সের এই অজানা জগৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করব।

ধৃতিমান দত্ত ও অন্যান্য

মডেল নির্মাতাদের প্রতি

আমি পত্রিকার আগ্রহী পাঠক। এই বইতে প্রদত্ত মডেলগুলি খুব ভাল লাগে এবং তৈরী করার ইচ্ছাও জাগে। কিন্তু যখন দোকানে কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায় না তখন ইচ্ছে ঘুচে যায়। যেমন ধরা যাক্ গত সংখ্যায় একটি মডেল ছিল "Fire Alarm". এই মডেলের মধ্যে দুটি জিনিস প্রয়োজন মত পেলাম না। যেমন পোটেনসিও মিটার ও থার্মিস্টার পাওয়া গেল না। কোথায় এই জিনিস পাওয়া যাবে মডেলের সঙ্গে যদি দেওয়া থাকত তবে হয়ত সমস্ত আগ্রহশীল পাঠকের সুবিধা হত। আশা করি আমার মত আগ্রহী পাঠকের কথা চিন্তা করে আগামী সংখ্যা থেকে মডেলের সঙ্গে প্রাপ্তিস্থানও দেওয়া থাকবে।

অভিজিৎ ব্যানার্জী, শিবপুর হাওড়া।

আত্মরক্ষায় রসায়ন

সমরজিৎ কর

প্রাণী এবং উদ্ভিদের আত্মরক্ষার ব্যাপার স্যাপার দেখলে সত্যিই যেন অবাক হতে হয়। বাঘ ভালুক এ সব প্রাণী আত্মরক্ষা করে গায়ের জোরে এবং ধারালো দাঁত ও নখের সাহায্যে। শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বেবুন তারাও এইভাবেই আত্মরক্ষা করে। সাপের তো কথাই নেই। বিশেষ করে সাপ যদি বিষাক্ত হয়, দেখা মাত্র অনেক প্রাণীই তার কাছ থেকে গা ঢাকা দেয়। আবার দেখ বর্ণচোরা গিরগিটি, দূর থেকে দেখে যেই তাকে ধরার জন্যে ছুটে গেলে, অমনি দেখবে ঘাসের মধ্যে হঠাৎ সে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজের গায়ের রঙটিও পাল্টে ঘাসের মধ্যে এমনভাবে মিশে রইলো, হয়ত সে তোমার কাছেই রয়েছে, কিন্তু সবুজ ঘাসের মধ্যে থেকে তাকে চিনতেই পারলে না। অনেক সময় দেখা যায় শিকারীর কাছেই বরফের উপর ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে 'মেরু ভালুক'। তার সরু লোম এমনই সাদা যে, তার অস্তিত্ব চট্ করে চোখেই পড়ে না। আমরা বলি 'পিঁপড়ের প্রাণ'। সেই দুর্বল পিঁপড়েও হুল

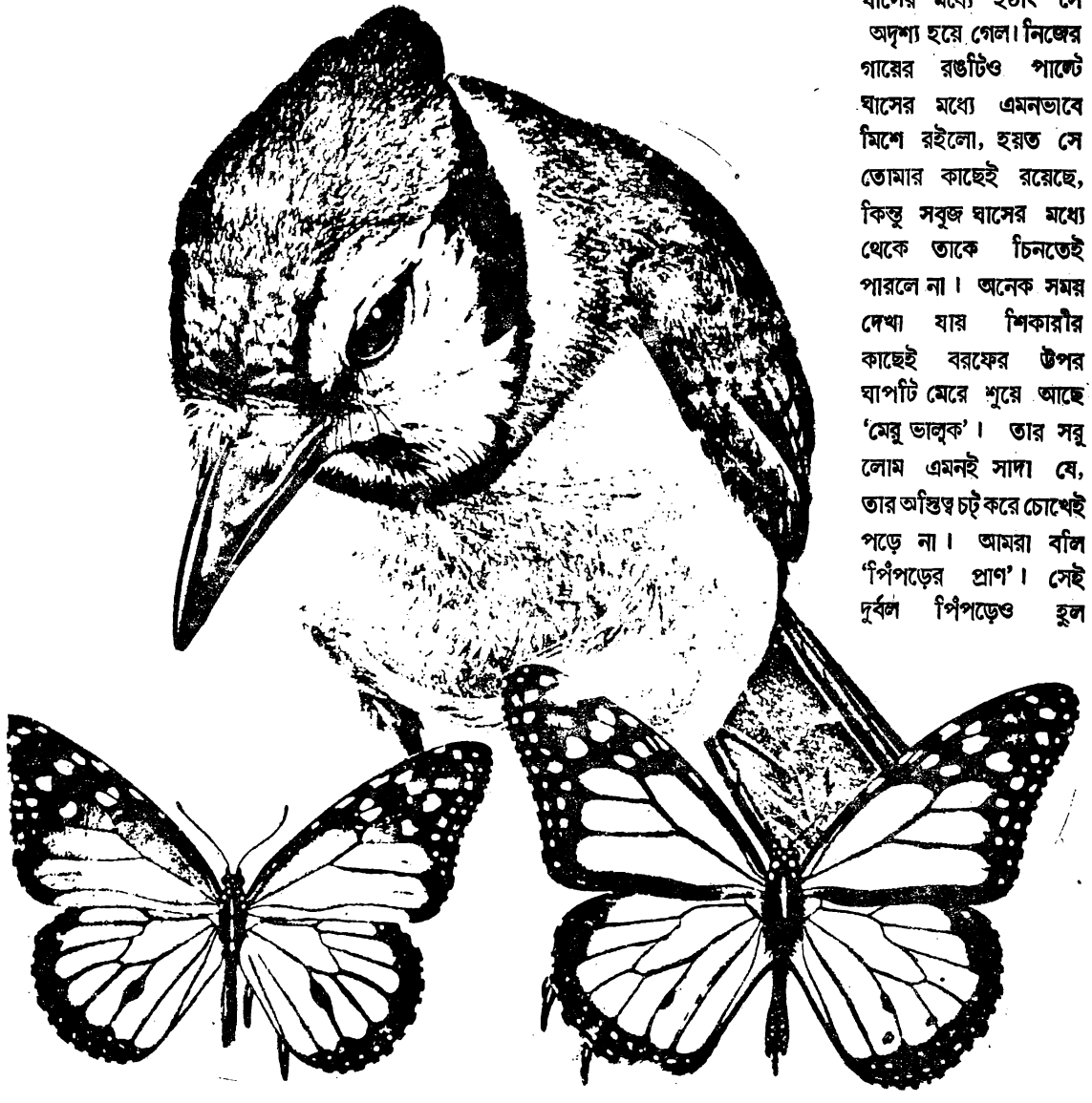

বিষ বহন করছে প্রজাপতি। তাই সামনে খাদ্য থাকা সত্ত্বেও পাখি নিশ্চুপ।

ফোটায়। তার ভয়েই অমন দুর্বল প্রাণীকেও তো আমরা এড়িয়ে চলি। আসল কথা হল, প্রকৃতি আত্মরক্ষার জন্যে প্রতিটি প্রাণীকে কোন না কোন ক্ষমতা দিয়েই থাকে। শুধু প্রাণীই বা কেন? উদ্ভিদকেও কি নয়?

অদ্ভুত একটি ব্যাপার লক্ষ করেছেন বিজ্ঞানীরা। দেখা গেছে বহু উদ্ভিদ নিজেদের শরীরে নানা রকম রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে। তা করুক। কিন্তু সেই সব যৌগ তৈরির তো একটা কারণ থাকা চাই? যেমন ধরো, মানুষ। মানুষ ভাত খায়। ভাতে থাকে শর্করা। এই শর্করা শরীরের মধ্যে তৈরি করে ইথাইল অ্যালকোহল। অ্যালকোহল রাসায়নিক ভাবে ভেঙ্গে গিয়ে দেয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল। সেই সঙ্গে উত্তাপ শক্তি। এই উত্তাপ শক্তি যোগায় আমাদের কাজ করার শক্তি। যেমন ধরো, উদ্ভিদে এক ধরনের যৌগ তৈরি হয়, যার নাম অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট বা সংক্ষেপে 'এটিপি', এই যৌগ শক্তি সঞ্চয় করে রাখে, প্রয়োজনে উদ্ভিদকে শক্তি যোগায়।

ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে কতকটা ধাঁধার মতই মনে হয়েছিল। পরে অবশ্য কিছু কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। দেখা গেছে এই সব যৌগ কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভিদ নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে কাজে লাগায়। যেমন ধরো, কোথাও হয়ত বিশেষ ধরনের গাছ রয়েছে। তার আশপাশে রয়েছে অন্যান্য গাছপালা। গাছের বাড়বাড়ন্তের জন্যে খাবার চাই। চাই জল। সেই খাবার এবং জল থাকে মাটিতে। সেই খাবার এবং জল টেনে নিয়ে আশপাশের গাছপালা যাতে না বাড়তে পারে, তার জন্যে চেষ্টা করে ওই বিশেষ ধরনের গাছ। আর এর জন্যে তারা কাজে লাগায় সেই সব রাসায়নিক যৌগ, যাদের গোড়ায় মনে হয়েছিল অর্থহীন। এই সব যৌগের স্পর্শে এসে আশপাশের গাছপালার বাড় যায় কমে, আর ওই বিশেষ ধরনের গাছ বহাল তবিয়তে ভোগ করতে থাকে মাটির পুষ্টি সামগ্রী এবং জল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব যৌগ পরজীবী জীবাণুদের মেরে ফেলে। এতে করে উদ্ভিদ রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়, পরজীবীরাও তাদের শরীর থেকে খাবার টেনে নিয়ে তাদের দুর্বল করতে পারে না। কখনো কখনো ওই সব রাসায়নিক যৌগের প্রভাবে অনেক কীটপতঙ্গ এবং প্রাণী ওই সব উদ্ভিদ থেকে দূরে থাকে। ফলে খাদকের হাত থেকে রক্ষা পায়। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের রাসায়নিক যৌগের ইংরেজি নাম রেখেছেন 'একোলজিক্যাল কেমিক্যালস'। বাংলায় যাদের বলা হয়—প্রতিবেশ সংক্রান্ত রাসায়নিক যৌগ।

সত্যি কথা বলতে কি, এই সব যৌগের কথা ভাবলে অবাকই হতে হয়। যেমন ধরো, কোন কোন গাছের এই ধরনের রাসায়নিক যৌগ বিষ। তবে সেই বিষের প্রতিক্রিয়া সবার মধ্যে ধরা পড়ে না। কোন কোন কীটপতঙ্গ ওই সব গাছের পাতা খেল, তাদের কিছুই হল না। কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীরা খেলেই বিপদ। তারা অসুস্থ হতে পারে। মারাও যেতে পারে। ধরা যাক এক ধরনের পাখি। সেই পাখি পতঙ্গ ভুক। কোন কীটের লার্ভা হয়ত এই গাছের পাতা খেয়েছে। সে মরল না। কিন্তু সেই পাখি যদি ওই লার্ভাদের খায়, তারা মারা পড়বে, লার্ভার শরীরে যদি থাকে ওই পাতার বিষ। এতে ওই লার্ভারই লাভ। পাখিরা তাদের আর খায় না, তাদের এড়িয়ে চলে। লার্ভারা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

কোস্টারিকায় এক ধরনের আগাছা জন্মায় ঘাসের সঙ্গে। ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'মিল্ক উইড'। বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাসক্লেপিয়াস কুরাসাভিকা (Asclepias Curassavica)। দেখা গেছে, মাঠে ঘাস খাওয়ার সময় গরু এই আগাছায় মুখই দেয় না। এই আগাছায় থাকে এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ যাদের বলা হয় গ্লাইকোসাইডস। এ সব যৌগ পেটে পড়লে গরু অসুস্থ হয়। মারাও যেতে পারে। তাই মাঠে ঘাস খাওয়ার সময় এই আগাছায় তারা মুখ দেয় না। অথচ এই মিল্ক উইডের উপরই নির্ভর করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানারকম প্রজাপতির 'লার্ভা'।

এক প্রজাতির আগাছা আছে, যাদের বলা হয় অ্যাসক্লেপিয়াডেসি (Assclepiadaceae) যাদের মধ্যে মিল্ক উইডও পড়ে। ওষুধ বিজ্ঞানীরা এদের পাতা নিয়ে গবেষণা চালান। তাঁরাই আবিষ্কার করেন, এই পাতায় 'ডিজিটালিস' এর মত এক শ্রেণীর যৌগ থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের উপর এই যৌগগুলির দারুণ প্রভাব। যাদের হৃদপিণ্ড দুর্বল, এই যৌগ খেলে সেই হৃদপিণ্ড সবল হয়ে ওঠে। বাড়ে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন। তাঁরাই পরীক্ষা করার পর জানতে পারেন ওই যৌগগুলি আসলে গ্লাইকোসাইডস, হৃদপিণ্ডের উপর তাদের প্রভাব থাকায় তাদের নাম রাখা হয় 'কারডিয়াক গ্লাইকোসাইডস' বা 'কারডেনোলাইডস'।

এই যৌগগুলির একটি খারাপ দিকও আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা লক্ষ করেন, কারডিয়াক গ্লাইকোসাইডস্ হৃদস্পন্দন বাড়াতে সাহায্য করলেও, মস্তিষ্কের বিশেষ এক ধরনের স্নায়ুদের করে দুর্বল। এই স্নায়ু দুর্বল হলে বমনের উদ্রেক হয়। তাই দেখা গেছে, বিষাক্ত লার্ভা খাওয়ার পর পাখি বা গরু বমি করে। বমি করলে তাদের পাকস্থলী থেকে বিষ বেরিয়ে যায়। কিন্তু বমি না হলেই বিপদ। অনেক সময় হয়ও না। তখন মারা পড়ে তারা। বিজ্ঞানীরা এই বিষে অন্তত তিন রকমের কারডিয়াক গ্লাইকোসাইডস আবিষ্কার করেছেন। যাদের নাম ক্যালাকটিন, ক্যালোট্রপিন।

বিচিত্রই কাণ্ড! উদ্ভিদকে রক্ষা করার জন্যে প্রকৃতিই রাসায়নিক অস্ত্র সংশ্লেষণ করে তাদের শরীরে। অর্থাৎ তৈরি করে এমন সব যৌগ যাদের ভয়ে মেরুদণ্ডী প্রাণীরা তাদের পাশে আসে না। আবার ওই বিষই রক্ষা করে প্রজাপতিদের। এ সব দেখে একটা কথাই মনে হয়—প্রকৃতি কত দয়ালু।

বিজ্ঞানের ডায়েরী—মে

বিমান বসু

বিজ্ঞানের জগতে প্রায় প্রতিদিনই কিছু ঘটছে। তাদের মধ্যে এমন কিছু ঘটনাও আছে যা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকে, যেমন কোনও বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্ম বা মৃত্যু, কিংবা কোনও যুগান্তকারী আবিষ্কার অথবা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনও মহৎ উপলব্ধি। এমনই কিছু নির্বাচিত ঘটনার সংকলন করা হয়েছে 'বিজ্ঞানের ডায়েরী'তে। আশা করি বিষয়টি তোমাদের ভালো লাগবে।—**বিমান বসু**

1 মে, 1958. এই দিন সর্বপ্রথম পৃথিবীর চারপাশে বিকিরণকারী 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট' (Van Allen Belt) এর সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকার 'এক্সপ্লোরার' (Explorer) উপগ্রহ থেকে অধ্যয়ন চালিয়ে জানতে পারা যায় যে, অতি উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণিকা, প্রধানত ইলেক্ট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত ঐ বেল্ট দু'টি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরটি রয়েছে

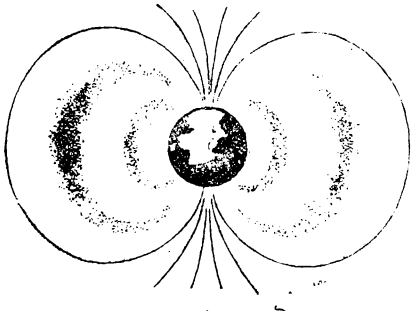

ভ্যান অ্যালেন বেল্ট

বিষুব রেখার 1000-5000 কিলোমিটার ওপরে। অপর স্তরটি আরও বিস্তৃত এবং সেটি রয়েছে ভূপৃষ্ঠের 15,000-20,000 কিলোমিটার ওপরে। এক্সপ্লোরার উপগ্রহ থেকে পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে ঐ দুটি স্তর আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী জেমস ভ্যান অ্যালেন (James Van Allen)।

2 মে, 1519. এই দিন বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর, ভাস্কর, বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার লেনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci) ফ্রান্স ভ্রমণকালে পরলোক গমন করেন! মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল 68 বছর। দা ভিঞ্চির আঁকা সবচেয়ে বিখ্যাত ছবির নাম "মনা লিসা" (Monalisa)

লেনার্দো দা ভিঞ্চি

যা বর্তমানে প্যারিসে সংগ্রহালয়ে রাখা আছে।

2 মে, 1965 এই দিনে সর্বপ্রথম ব্যবসায়ীক ভাবে উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়। দূরসঞ্চার উপগ্রহটির নাম 'আর্লি বার্ড' (Early Bird)। এর আগে 'টেলস্টার' (Telstar) উপগ্রহ মারফৎ আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছিল।

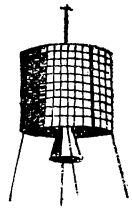

আর্লি বার্ড

10 মে, 1901 এই দিন লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-দের এক সমাবেশে জগদীশচন্দ্র বসু জীব ও জড় নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার ফলাফল প্রস্তুত করেন। তাঁর ঐ সান্ধ্য বক্তৃতার বিষয় ছিল 'যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড়বস্তুর সাড়া'। তিনি ঐ সভায় পরীক্ষা করে দেখিয়ে দেন যে জীবিত পেশীকে বা স্নায়ুকে মোচড় দিলে যে ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়, ঐ জায়গায় এক টুকরো টিনের তারকে বেঁধে দিলে একেবারে একই ধরনের সাড়া পাওয়া যায়। তিনি প্রমাণ করে দেন যে জীবিত স্নায়ু বা পেশীতে যেমন ক্লান্তির লক্ষণ দেখা দেয়, টিনের তারেও ঠিক একই রকম ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

13 মে, 1931 বিশ্বের সর্বপ্রথম চার-ইঞ্জিন যুক্ত বিশাল এরোপ্লেন এই দিন আকাশে ওড়ে।

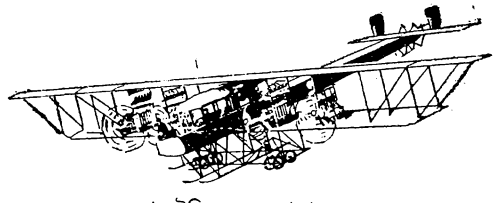

চার ইঞ্জিনযুক্ত এরোপ্লেন।

14 মে, 1973 মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র 'স্কাইল্যাব' (Skylab) কে এই দিন আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষেপণ করে ভূপৃষ্ঠের 430 কিলোমিটার ওপরে কক্ষপথে পাঠানো হয়। 25 মিটার লম্বা এবং 6 6 মিটার ব্যাসের বেলনাকার মহাকাশ কেন্দ্রটিতে তিনজন

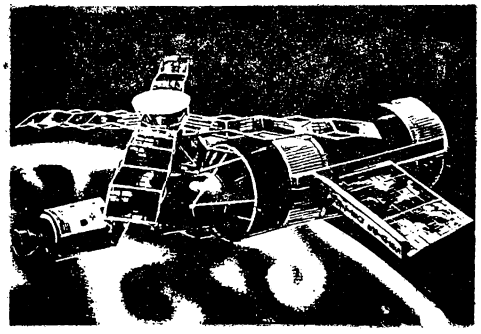

স্কাইল্যাব

মানুষের থাকার ও গবেষণা চালিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা ছিল। উৎক্ষেপণের পরই একটি সৌর প্যানেল ও তাপপ্রতিরোধক আবরণ নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত স্কাইল্যাব ভাল ভাবেই কাজ করে। 1974 সালে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্কাইল্যাব থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। তিনবার এর যাত্রি বদল করা হয়। শেষ পর্যন্ত 1979 সালের জুলাই মাসে স্কাইল্যাব কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর ধ্বংস হয়ে যায়।

15 মে, 1859 এই দিনটিতেই বিখ্যাত পদার্থবিদ এবং মাদাম কুরি'র স্বামী পিয়েরে কুরি (Pierre Curie) র জন্ম হয়। রেডিয়াম নিয়ে গবেষণার জন্য পিয়েরে ও মাদাম কুরিকে যৌথভাবে 1903 সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

পিয়েরি কুরি

17 মে, 1630 এই দিন সর্বপ্রথম দূরবিনে বৃহস্পতি গ্রহের গায়ে সমান্তরাল দাগ চোখে পড়ে। পরে জানতে পারা গেছে যে ঐ দাগ বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন রং এর মেঘের স্তর যা গ্রহটির তীব্র বেগে ঘোরার ফলে বিষুবরেখা বরাবর সমান্তরাল ভাবে ছড়িয়ে আছে।

বৃহস্পতির দাগ

18 মে, 1974 রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল পোখরানে এই দিন ভারতের প্রথম ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ঐ বিস্ফোরণে ব্যবহৃত প্লুটোনিয়াম ভারতেই তৈরি করা হয়েছিল।

29 মে, 1919 এই দিন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সময় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (Theory of Relativity) প্রথম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের মত বিশাল কোনও বস্তুর পাশ দিয়ে যাবার সময় বস্তুটির মহাকর্ষের টানে আলোর রশ্মি বেঁকে যাওয়া উচিত। সাধারণতঃ এ ঘটনা প্রমাণ করা অসম্ভব কারণ সূর্য নিজেই খুব উজ্জ্বল। তবে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় সূর্য যখন চাঁদের পেছনে ঢাকা পড়ে যায় সে সময় এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। 1919 সালের ঐ পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় সূর্য বৃষরাশিতে ছিল। সে সময় উত্তর ব্রাজিলের সোব্রাল ও পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে প্রিনসিপে দ্বীপ থেকে গ্রহণের সময় তোলা বৃষরাশির ছবিতে দেখা গেল যে কয়েকটি তারা যেন অন্য সময় তোলা ছবির তুলনায় সামান্য সরে গেছে, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত সূর্যের মহাকর্ষের টানে তারার আলো বেঁকে যাওয়ার ফলে। অর্থাৎ প্রমাণিত হয়ে গেল যে আইনস্টাইনের তত্ত্ব ঠিক।

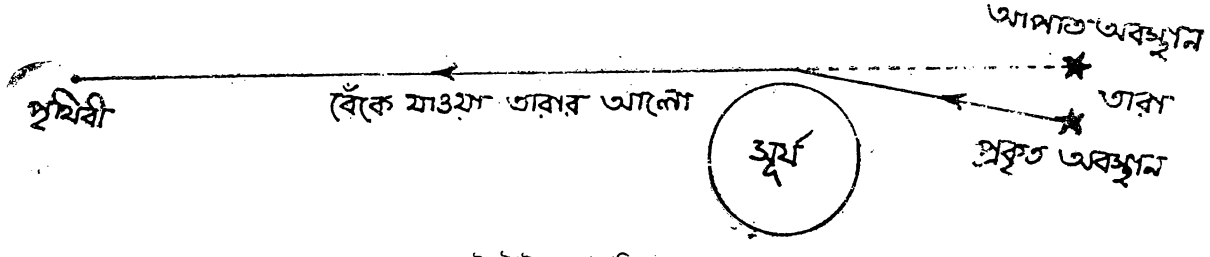

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব

প্রাণী বিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

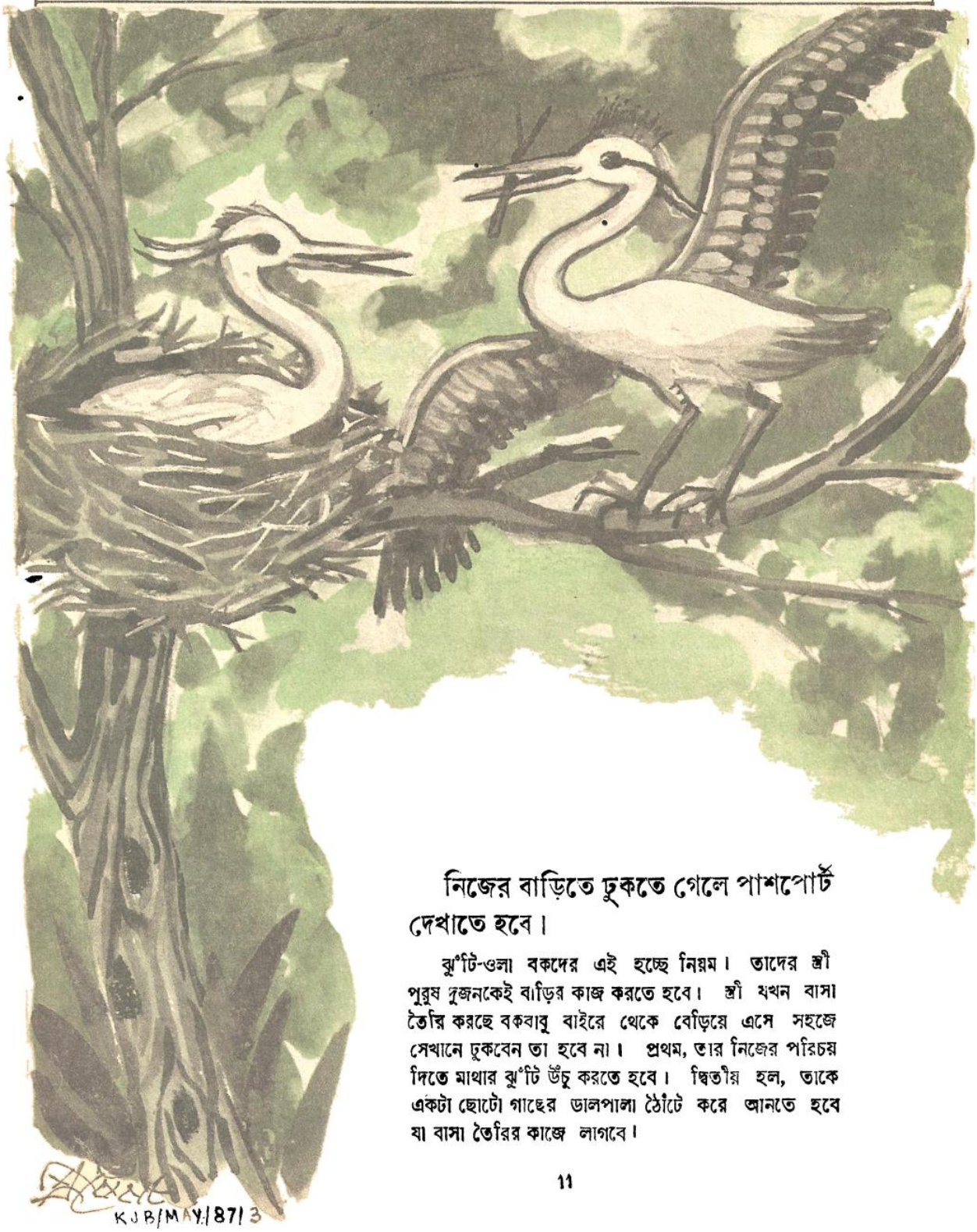

নিজের বাড়িতে ঢুকতে গেলে পাশপোর্ট দেখাতে হবে।

ঝুঁটি-ওলা বকদের এই হচ্ছে নিয়ম। তাদের স্ত্রী পুরুষ দুজনকেই বাড়ির কাজ করতে হবে। স্ত্রী যখন বাসা তৈরি করছে বকবাবু বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে সহজে সেখানে ঢুকবেন তা হবে না। প্রথম, তার নিজের পরিচয় দিতে মাথার ঝুঁটি উঁচু করতে হবে। দ্বিতীয় হল, তাকে একটা ছোটো গাছের ডালপালা ঠোঁটে করে আনতে হবে যা বাসা তৈরির কাজে লাগবে।

KJB/MAY/87/3

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

খ্রীস্টাব্দ 1506। স্পেনের রাজপথে এক অসহায় ভিক্ষুক চলেছেন টলতে টলতে। ষাট বছরের বৃদ্ধ ক্রিস্টোফার এক সরাইখানার সামনে দাঁড়ালেন—সারাদিন কিছু খাইনি। দয়া করে কিছু খেতে দেবেন আমাকে?

পান-ভোজনে উন্মত্ত সরাইখানার কে একজন অট্টহাস্য করে উঠলো—দেখ, দেখ, সেই বুড়োটা। আবার এসেছে।

হ্যাঁ, এখানে ওখানে অনেকবারই ওকে দেখেছি। মনে হয়—এমন অবস্থা ওর আগে কখনো ছিল না। ভালো করে তাকিয়ে দেখেছো?

তা ঠিক। কুঁচকে যাওয়া চামড়ার ভিতর দিয়ে দুটো চোখ কী প্রত্যাশায় এখনো উজ্জ্বল। একদা যেন নায়ক ছিল লোকটি। হুকুম দেবার জন্যেই জন্মেছিল।

তুমি কে হে? এমন অবস্থা কেন হোল?

আমাকে বলছেন? আমার নাম ক্রিস্টোফার।

ক্রিস্টোফার? কই, এ নাম তো আগে শুনিনি।

শোনেন নি? আমি এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করে তা উপহার দিয়েছি রাজা ফার্দিনান্দ আর রানী ইসাবেলাকে। আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়েছি আমি। ভারতবর্ষে যাবার জলপথ আমিই দেখিয়েছি ইউরোপের মানুষকে। ভারতবর্ষ—সোনার দেশ, থরে থরে সোনা সেখানকার মাটিতে।

তবে সেইখানেই তুমি যাচ্ছো না কেন হে? আমাদের সরাইখানায় এসেছো ভিক্ষা করতে?

ভদ্রগণ, দয়া করে বিদ্রূপ করবেন না। সে বয়স আমার নেই।

তাহলে তোমার রাজা? তার কাছে যাচ্ছো না কেন?

রা—জা! রা—নী! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রিস্টোফার থামলেন। শয়তানের দল তাঁর মন এখন বিষিয়ে দিয়েছে। উঃ, বড়ো কষ্ট! দয়া করে কিছু খেতে দিন আমাকে।

যাঃ, যাঃ সরে যা এখান থেকে। একজন মাতাল তাঁকে ঠেলে দিল সামনের রাস্তায়। একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন ক্রিস্টোফার। চোখের সামনে অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে আসতে লাগলো।

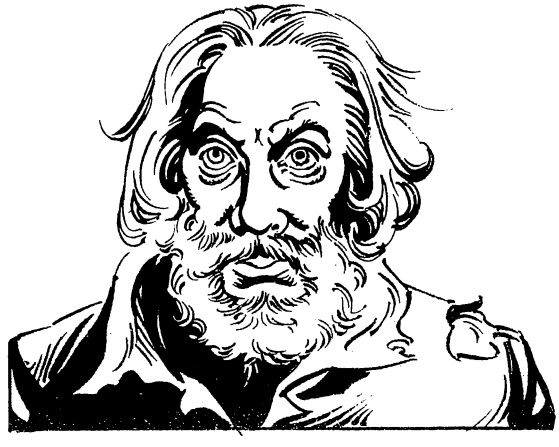

কতো বছর পিছনে এক সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ছেলে। দূর দিগন্তের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে। মৃতপ্রায় ক্রিস্টোফারের চোখের সামনে যেন ছল ছল করে উঠলো সমুদ্রের জল। ঐ দূরের দিগন্তে একটা জাহাজের পাল একটু একটু করে জেগে উঠছে। আনন্দে হাততালি দিচ্ছে বালক ক্রিস্টোফার। পাশে তার দুই ভাই — বার্থোলমিউ আর দিয়িগো।

শহরটির নাম জেনোয়া। বাবা জাতিতে তন্তুবায়। লেখাপড়া জানেন সামান্য। তাই বালক ক্রিস্টোফারের জন্যে বংশগত পেশার বাইরে তিনি কিছু ভাবেননি। তবু নাম সই করা বা হিসেব রাখা, এসবের প্রয়োজন তো জীবনে আছেই। তাই পাঠশালায় ছেলেটিকে দেখা গেল একদিন। কী দারুণ তার অধ্যবসায়, আর কী অপূর্ব হস্তাক্ষর! মাস্টার মশায় তার বাবাকে এসে বললেন—আপনার ছেলেটি সত্যি অসাধারণ। এই বয়সেই ওর হাতের লেখা এতো সুন্দর। ওকে আরও পড়ান। তাহলে আর তাঁত চালিয়ে খেতে হবে না। বই নকল করেই ও বড়লোক হয়ে যাবে।

দিন যায়। অঙ্ক আর ছবি আঁকাতেও বেশ নাম করে ফেললো ক্রিস্টোফার। ল্যাটিন ভাষাও অল্প দিনের মধ্যে শিখে ফেললো।

বিকেল কাটে জেনোয়া বন্দরের ধারে। দিক চক্রবালের অপার রহস্য তাকে টানে। মহাসমুদ্র আটলান্টিক। কতো দূর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি? পরপারে কোনও দেশ কি কোথাও নেই? কী করে সেখানের মানুষজন? এত যে সব নৌকা আর জাহাজ এখানে জড়ো হচ্ছে আর চলে যাচ্ছে ঐ নীল জলের আড়ালে, আবার আসছে, ওরা কোথায় যায়? কতো দূর?

সহৃদয় কোনও নাবিক দেখলেই তার সঙ্গে ভাব জমায় ক্রিস্টোফার। তার আপন দেশের গল্প শোনে। সেখানকার মানুষজন, ঘরবাড়ি, বন-পাহাড়, পশু-পাখিদের কথা শুনে অবাক হয়। অপরিচিত সেই দেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আরও, আরও অনেক কিছু সে জানতে চায়। কৌতূহল কিছুতেই মেটে না। মনে মনে ভাবে—নকলনবীশ সে হবে না। বাবার জীবিকাতেও যাবে না। তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। দিকহীন সমুদ্রে সে সভ্যতার জয়পতাকা নিয়ে পাড়ি দেবে অজানা ভূখণ্ডে। আবিষ্কার করবে এক নতুন জগৎ।

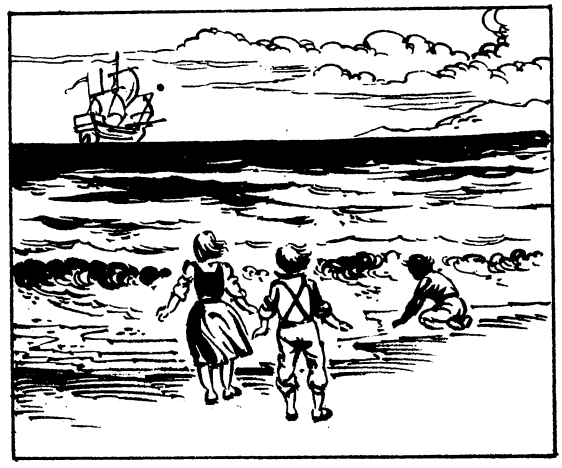

ডালিম

পুষ্টিকর, সুস্বাদু ডালিম ফল সকলেরই কাছে সুপরিচিত। এমাসে সেই ডালিম গাছের কথা বলব। ডালিম সকলেরই খুব প্রিয় তাই আজকাল অনেকেই

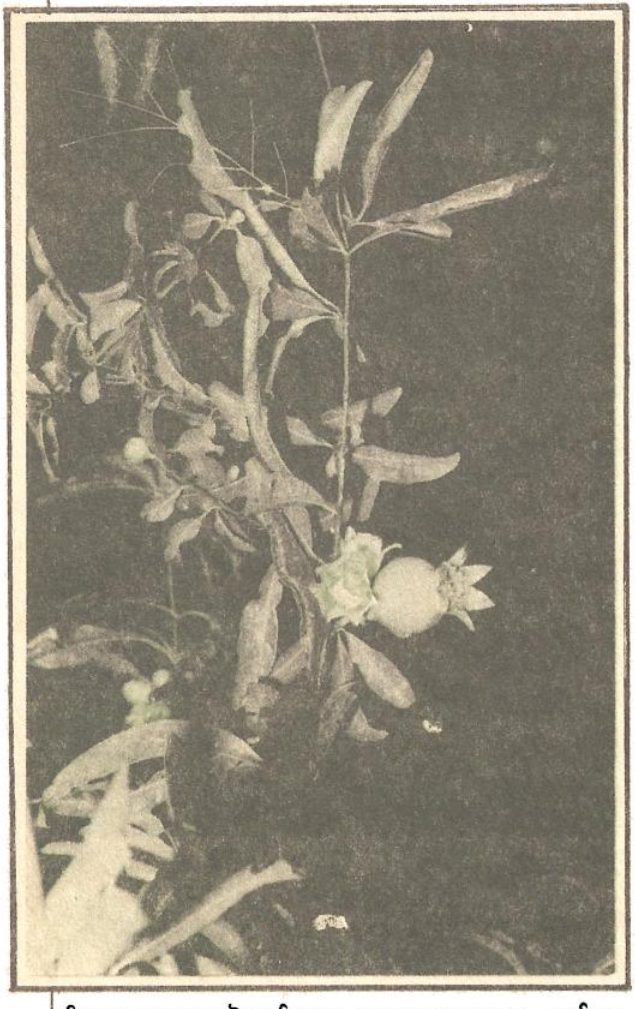

নিজের বাগানে এই ডালিমের চাষ করে থাকেন। ডালিম ফুলও বাগানের শোভা বাড়ায়। লালচে কমলালেবু রঙের, কখনও হলদে রঙের হয় প্রায় 3·7 থেকে 5·0 সে.মি. ব্যাসযুক্ত ফুলগুলি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্চ থেকে নভেম্বর এই সময় ফুলের সমারোহ হয়।

এই ডালিম গাছ 2 5—4 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ বলা যেতে পারে। এর আদি নিবাস ইরান। বৈজ্ঞানিক নাম পুনিকা গ্র্যানাটাম এবং পুনিকেসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী লিনিয়স্ প্রথম এই উদ্ভিদটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনা করেন। এই ডালিমকে ইংরাজীতে পমগ্রানিট্, হিন্দিতে অ্যানার, বাংলায় ও অসমীয়াতে ডালিম, মারাঠী ও কানাড়ীতে ডালিম্বা; তেলেগুতে ডালিম্মা; তামিলে মাদালাই; মালায়ালামে দাড়িম্যান, গুজরাতিতে দাদাম বলে।

ডালিম ফলগুলি বহুবীজপত্রী হয়। খোসা খুব শক্ত কাষ্ঠল হয় ও মাথায় মুকুটের মত বৃতিগুলি চিরস্থায়ী থাকে। প্রতিটি বীজকে পরিবেষ্টিত করে রসাল মাংসল অংশ থাকে যার রঙ লালচে গোলাপী বা কখনও সাদাটে হয়। এই টাটকা রসাল অংশ শরীরের পক্ষে খুব উপকারী ও পুষ্টিকর। ফলের এই রসাল অংশের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে জলীয় অংশ 78·0, প্রোটিন 1·6; চর্বি—0·1; তন্তু 5·1; শর্করা 14·5; খনিজ বস্তু 0·7%; ক্যালসিয়াম 10; ম্যাগনেশিয়াম 12; অক্সালিক অ্যাসিড 14; ফসফোরাস 70·0; লৌহ 0·3; সোডিয়াম 0·9; পটাশিয়াম 133·0; তামা 0·2; সালফার 12·0; ক্লোরিন 2·0; ক্যারোটিন 0; থায়ামিন 0·06; রাইবোফ্লেভিন 0·10; নিকোটিনিক অ্যাসিড 0·30; ভিটামিন সি 14 মি.গ্রা./100 গ্রা. পাওয়া যায়।

টাটকা ফলের রস শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে। অজীর্ণ-রোগে ফলপ্রদ ও মৃদুবিরেচক। তাছাড়া প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে বিভিন্ন রোগে যেমন পাকস্থলী, যকৃত, প্লীহা, হৃদযন্ত্র, নার্ভ সংক্রান্ত রোগে আরোগ্য লাভে সহায়তা করে।

ফুলের কুড়ি গুঁড়ো করে ব্রঙ্কাইটিস রোগে ব্যবহার করা হয়। আমাশয় রোগে পাতা ও বল্কল উপকারী। ফিতাকৃমি রোগে মূলের ও কাণ্ডের বল্কল বিশেষ ফলপ্রদ।

ফুল ও ফলের খোসা থেকে রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায়। ফুল থেকে হাল্কা লাল ও খোসা থেকে হলুদ বাদামী থেকে খাকী রঙের রঞ্জক পদার্থ পশম ও সিল্ক ব্যবহার করা হয়।

আরও একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য, সেটি হল এই গাছটির সর্বত্রই ট্যানিন পাওয়া যায়। এই ট্যানিন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যেটি কালিশিল্প ও চামড়াশিল্পে বিশেষ প্রয়োজন হয়।

—এণাক্ষী বিশ্বাস

ফটো ঃ সুবলকৃষ্ণ দে

মৌলপরিচিতি ঃ হাইড্রোজেন

অমরনাথ রায়

যে সব পদার্থ হতে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে সেই সব পদার্থ ছাড়া আলাদা ধর্মবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না তাদেরই আমরা মৌলিক পদার্থ বা সংক্ষেপে মৌল বলে থাকি। প্রকৃতিতে মোট 92টি মৌল পাওয়া যায়। পর্যায় সারণীতে মৌল শুরু হয়েছে হাইড্রোজেন দিয়ে আর শেষ হয়েছে ইউরেনিয়াম দিয়ে। এই বিরানব্বইটি প্রকৃতিজাত মৌল ছাড়া বিজ্ঞানীরা আরও তেরটি মৌলের সন্ধান পেয়েছেন। এরা সাধারণ মৌলের পর্যায়ভুক্ত নয়। কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরীতে এদের প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এদের আয়ুষ্কাল খুবই কম। যাই হোক প্রকৃতিজাত 92 টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে 70টি হলো ধাতুর পর্যায়ভুক্ত 16টি অধাতুর পর্যায়ভুক্ত এবং বাকি 6টি নিষক্রিয় গ্যাসীয় মৌল।

প্রকৃতিতে অক্সিজেনই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে, শতকরা পরিমাণ প্রায় 98·6%, আর সবচেয়ে কম পরিমাণে আছে যে মৌলটি, তার নাম অ্যাস্টাটিন, শতকরা পরিমাণ মাত্র $4+10^{20}$%। সব মৌলের মধ্যে হীরার (বিশুদ্ধ কার্বনের) গলনাংক সবচেয়ে বেশি, প্রায় 4500°c এবং স্ফুটনাংক, সবচেয়ে বেশি রেডিয়াম এর, প্রায় 5630°c হিলিয়াম এর গলনাংক (—269·7°c) এবং স্ফুটনাংক (····268·44°c) সবচেয়ে কম। সব মৌলের মধ্যে হীরা (কার্বন) কঠিনতম, লঘুতম মৌল হলো লিথিয়াম। তাপ ও তড়িতের সবচেয়ে সুপরিবাহী হলো রূপা। সবচেয়ে নরম ধাতু হলো সিজিয়াম। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যৌগ গঠন করে কার্বন। হিলিয়াম মৌলটির গলনাংক এবং স্ফুটনাংকের মধ্যে পার্থক্য সবচেয়ে কম, মাত্র 0·756°c বিসমাথের চেয়ে বেশি। পারমাণবিক ক্রমাংক বিশিষ্ট প্রতিটি মৌলই তেজস্ক্রিয়। গলনাংক ও স্ফুটনাংকের মধ্যে পার্থক্য সবচেয়ে বেশি। গ্যালিয়াম এর সবচেয়ে সক্রিয় মৌল হলো ফ্লোরিন। আর হিলিয়াম, আর্গন, জেনন্ ইত্যাদি মৌলগুলি নিষ্ক্রিয়। মৌলদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি হলো চুম্বকীয় পদার্থ। সেই তিনটি মৌলের নাম আয়রন নিকেল ও কোবাল্ট। ধাতব মৌলদের মধ্যে পারদই একমাত্র তরল। অসমিয়াম এর আপেক্ষিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি (22·48)।

ধাতুদের মধ্যে সোনা সবচেয়ে বেশি প্রসারণশীল আর তাপ পরিবহন করবার ক্ষমতা বিসমাথের সবচেয়ে কম।

ভূমিকা ছেড়ে এবার হাইড্রোজেনের কথায় আসা যাক। হাইড্রোজেন এর চিহ্ন H, পরমাণু ক্রমাংক = 1, পারমাণবিক গুরুত্ব = 1·00797, আণবিক সংকেত = H_2, সবচেয়ে হাল্কা মৌল (ঘনত্ব = 0·08987 গ্রাম/লিটার প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায়) এবং এর স্ফুটনাংক = 252·8°C।

ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ 1766 সালে সর্বপ্রথম এই মৌলটিকে আবিষ্কার করেন। লঘু খনিজ অ্যাসিডের সঙ্গে ধাতুর বিক্রিয়া ঘটিয়ে তিনিই প্রথম এই মৌলিক গ্যাসটিকে প্রস্তুত করেন এবং প্রমাণ করেন যে গ্যাসটি দাহ্য। আবার সেই ক্যাভেণ্ডিশই হাইড্রোজেন আবিষ্কারের পনের বছর পরে 1781 সালে পরীক্ষার দ্বারা দেখান যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল উৎপন্ন হয়। ক্যাভেণ্ডিশ হাইড্রোজেন আবিষ্কারের পর তার নাম রেখেছিলেন দাহ্য গ্যাস। এরপর 1783 সালে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে জল থেকে সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন প্রস্তুত করেন এবং তিনিই মৌলটির নাম রাখেন হাইড্রোজেন অর্থাৎ কিনা 'জল উৎপাদক'।

বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বে শতকরা 70 ভাগ হাইড্রোজেন আছে। আবার আমাদের সূর্যেরও বেশির ভাগ অংশ হাইড্রোজেন। পৃথিবীতে অবশ্য হাইড্রোজেন বেশি পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অনেক উপরের বায়ুমণ্ডলে মাত্র 3% হাইড্রোজেন আছে। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হাইড্রোজেন অণু গঠন করে এবং হাইড্রোজেনের এই অণুগুলো নির্গমন গতিবেগের কাছাকাছি বেগে চলে। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর উষ্ণতা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সেই বেশি উষ্ণতায় হাইড্রোজেনের অণুগুলো হয়তো আরও হাল্কা ও গতিশীল হয়ে দ্রুতবেগে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। হয়তো সেই কারণেই এখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন প্রায় কিছুই সঞ্চিত নেই। সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে ভূত্বকে আর মহাসমুদ্রের পরমাণুর ভাঁড়ারে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ঐ পরিমাণ হাইড্রোজেনকে যে ভাবেই হোক, কোনও মতে আঁকড়ে ধরে

আছে। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের শরীরের সকল পরমাণুর মধ্যে পাঁচ ভাগের তিন ভাগই হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণু।

1927 সালে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী হেইজেনবার্গ হাইড্রোজেনের দু'টি রূপভেদ আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন সর্বদাই লাটিমের মতো ঘোরে। যে সব হাইড্রোজেন অণুর প্রোটন দু'টির ঘূর্ণন একমুখী বা সমান্তরাল, তাদের নাম অর্থো হাইড্রোজেন, আর যে সব হাইড্রোজেন অণুর প্রোটন দু'টির ঘূর্ণন বিপরীতমুখী, তাদের নাম প্যারা হাইড্রোজেন।

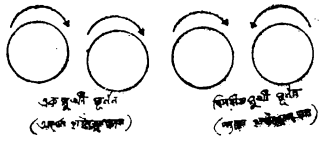

অর্থো এবং প্যারা হাইড্রোজেনই হলো হাইড্রোজেনের দু'টি রূপভেদ। সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাসে 75% অর্থো এবং 25% প্যারা হাইড্রোজেন থাকে।

হাইড্রোজেনের আবার তিনটি আইসোটোপ বা সমস্থানিক আছে। পরমাণু কেন্দ্রে একই সংখ্যক প্রোটন সমন্বিত একই মৌলের বিভিন্ন পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট পরমাণুগুলিকে পরস্পরের আইসোটোপ বা সমস্থানিক বলে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন সংখ্যার তারতম্যের জন্যেই আইসোটোপের উদ্ভব হয়। হাইড্রোজেনের প্রথম আইসোটোপটির নাম 'প্রোটিয়াম'। প্রোটিয়ামের নিউক্লিয়াসে কেবল একটি মাত্র প্রোটন আছে। হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় আইসোটোপটির নাম 'ডয়টেরিয়াম'। এর নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন আছে। হাইড্রোজেনের তৃতীয় আইসোটোপটির নাম ট্রাইটিয়াম! এর নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন এবং 2 টি নিউট্রন আছে। প্রকৃতিতে যে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তার 99.985% হলো প্রোটিয়াম এবং অবশিষ্টাংশ ডয়টেরিয়াম। ট্রাইটিয়ামকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয়। আর সেইজন্যেই ট্রাইটিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। হাইড্রোজেনের এই তিনটি আইসোটোপের পারমাণবিক গুরুত্ব আলাদা। প্রোটিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব1·0078, ডয়টেরিয়ামের 2.61472 এবং ট্রাইটিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব = 3·0171

অ্যাসিড, ক্ষার ও জল থেকে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয়। লঘু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে অবিশুদ্ধ জিংক, আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর বিক্রিয়ায় সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। আবার সাধারণ উষ্ণতায় সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতু জলকে বিশ্লিষ্ট করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাস বায়ু বা অক্সিজেনে নীলাভ শিখায় জ্বলে কিন্তু দহনে সহায়তা করে না। হাইড্রোজেন খুবই হালকা গ্যাস। একে বিশ্বের লঘুতম ও ক্ষুদ্রতম মৌল আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না। হাইড্রোজেনের বিজারণ ধর্ম আছে। অনেক ধাতব অক্সাইডকে হাইড্রোজেন ধাতুতে বিজারিত করতে পারে। কোন যৌগ থেকে যখন হাইড্রোজেন সদ্য মুক্ত হয়, তখন সেই জন্মমুহূর্তের হাইড্রোজেনকে জায়মান হাইড্রোজেন বলে। জায়মান হাইড্রোজেন সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। প্ল্যাটিনাম, প্যালাডিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি ধাতু উত্তপ্ত অবস্থায়, এমন কি সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ করতে পারে। প্যালাডিয়াম তার 900 গুণ আয়তনের হাইড্রোজেনকে শোষণ করতে পারে। ধাতুর এই রকম গ্যাস শোষণ ক্ষমতার নাম 'অন্তর্ধূতি'।

দুটি টাংস্টেন তড়িৎদ্বারের মধ্যবর্তী তড়িৎ শিখায় (1100 – 2000°C) হাইড্রোজেন গ্যাস জেট আকারে প্রবাহিত করলে উৎপন্ন হয় 'পারমাণবিক হাইড্রোজেন'। এই পারমাণবিক হাইড্রোজেন রাসায়নিকভাবে খুবই সক্রিয় এবং শক্তিশালী বিজারণধর্ম সম্পন্ন। কোন বস্তুর উপর এই পারমাণবিক হাইড্রোজেন পড়লে সেখানে পুনরায় যুক্ত হয়ে তা আণবিক হাইড্রোজেনে পরিণত হয় এবং এতে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপ দ্বারা টাংস্টেন ধাতুকে (গলনাংক 3370°C) পর্যন্ত গলানো যায়।

অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা (উষ্ণতা প্রায় 2000°c) উৎপন্ন করতে, মিথাইল অ্যালকোহল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া ও কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুত করতে হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বনস্পতি শিল্পেও হাইড্রোজেনের চাহিদা প্রচুর। আগেকার দিনে বেলুন ওড়াবার কাজে এই গ্যাসটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতো!

এই প্রবন্ধ রচনার কাজে যে সব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, তার তালিকা ঃ

1। মহাবিশ্বের মৌল উপাদান—আইজাক এসিমোভ
2। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ—কানাইলাল মুখোপাধ্যায়
3। উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) —ডঃ রণজিৎ দাস

উপরোক্ত লেখকদের কাছে আমি ঋণী।

অমরনাথ রায় এন. বি. টি—99এ, নিউট্রাফিক পোঃ—ইন্দা (খড়্গপুর), জেলা ঃ মেদিনীপুর পিনঃ 721305

পাতালরেল টালিগঞ্জে পৌঁছে গেল

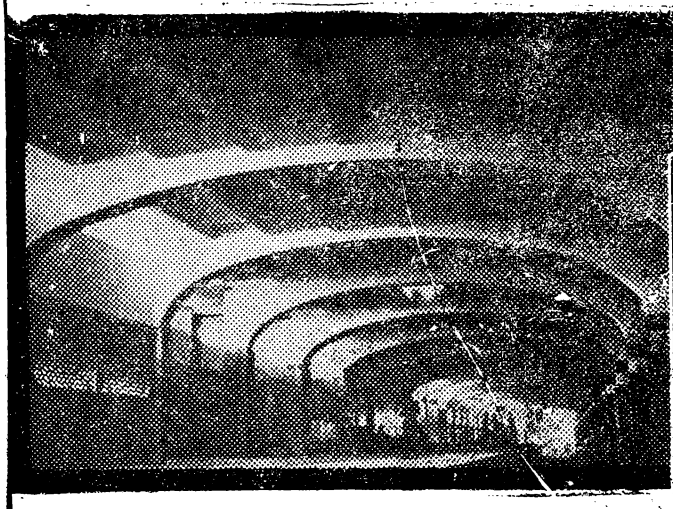

এসপ্ল্যানেড — টালিগঞ্জের মধ্যে চালু হল মেট্রো রেল। লক্ষ মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আশার প্রাণবন্ত রূপায়ণ এই উদ্‌বোধন। অবসন্ন মহানগরীতে আজ এসেছে গতির স্পন্দন। ১৬ মিনিটে ৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া আজ সম্ভব। তাও সুস্থ আর নির্মল পরিবেশে। মেট্রো তার ইঞ্জিনীয়ার এবং কর্মীদের এই অপূর্ব কর্মকুশলতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। অভিনন্দন জানাচ্ছে কলকাতাবাসীকে, তাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য। এসপ্ল্যানেড — টালিগঞ্জ শাখাটি মেট্রোর অগ্রগতির এক বিরাট পদক্ষেপ।সেদিন আর বেশী দূরে নয় যখন মেট্রো দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে মাত্র ৩৩ মিনিটে।

মেট্রো-এক সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা (ভারত সরকারের একটি দপ্তর)

ARYADAYA/MR/B180

বিজ্ঞানীদের টুকিটাকি

অমরনাথ রায়

[এক]

স্যার আইজাক নিউটন তাঁর প্রথম জীবনী লেখক উইলিয়াম স্টাক্‌লিকে একদা রাত্রিকালীন আহারের জন্য তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। স্টাক্‌লি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে যখন এলেন, তখন দেখলেন যে নিউটন পড়াশুনায় গভীরভাবে মগ্ন। স্টাক্‌লি ভাবলেন, স্যার আইজাককে এখন বিরক্ত করা উচিত হবে না। —এই ভেবে তিনি ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নিউটন

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর স্টাক্‌লি ধৈর্য হারালেন। তিনি স্যার আইজাকের রান্না ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং দেখলেন যে টেবিলের উপর খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। স্টাক্‌লি ভাবলেন যে বিজ্ঞানী নিউটন বোধ হয় আহার শেষ করে নিয়েছেন এবং টেবিলে তাঁর খাবারটাই রাখা আছে। —এই ভেবে স্টাক্‌লি ঢাকনা খুলে খাবারটা খেয়ে নিলেন।

ইতিমধ্যে স্যার আইজাকও রান্নাঘরে এসে ঢুকলেন এবং দরজার গোড়ায় স্টাক্‌লিকে দেখে বললেন, "একটু অপেক্ষা কর। চট্‌ করে খাবারটা খেয়ে নিই। তারপর তোমার সঙ্গে কাজে বসব।"—এই বলে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন বিজ্ঞানী। দেখলেন যে, টেবিলে কিছু এঁটোকাঁটা পড়ে আছে। খাবার থালাটা খালি পড়ে আছে। তাই দেখে তিনি স্টাক্‌লিকে বললেন, "দেখেছ, যারা বেশি পড়াশুনা করে তাদের এমনই ভুলো মন হয়। কখন যে এক ফাঁকে রাতের খাবারটা খেয়ে নিয়েছি তা মনেই নেই।"

—আসলে স্যার আইজাক ভুলেই গিয়েছিলেন যে তিনি স্টাক্‌লিকে সে রাতে তাঁর সঙ্গে আহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

[দুই]

বিখ্যাত বিজ্ঞানী 'হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ' নারীদের দেখলে বড্ড লজ্জা পেতেন। তাই সর্বদা তিনি নারীদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতেন।

একবার নিজের বাড়িতে সিঁড়িতে তিনি তাঁর রাঁধুনীর মুখোমুখি হন এবং তখন বড়ই লজ্জা পান। —সেই দিনই ক্যাভেণ্ডিশ এক ঠিকাদারকে ডেকে বলে দেন—বাড়ির পিছন দিক থেকে উপরে উঠবার একটা সিঁড়ি বানিয়ে দিতে।

শুধু তাই নয়। কোন্ দিন তিনি কি কি খাবার খেতে চান তা এক টুকরো কাগজে লিখে রাঁধুনীর অনুপস্থিতিতে সেই কাগজটি রান্নাঘরের টেবিলে রেখে দিয়ে আসতেন। রাঁধুনী সেই মতো রান্না করে টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখতো।

সে চলে গেলে পর ক্যাভেণ্ডিশ খাবার খেতে যেতেন।

সন্ধের পর বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিশ বেড়াতে যেতেন। বেরুবার আগে একবার রাস্তার এদিক, আর একবার ওদিক বেশ ভালভাবে দেখে নিতেন, কাছে পিঠে কোনও মহিলা আছেন কিনা।

একবার সব দেখেশুনে নিয়েই ক্যাভেণ্ডিশ বেরুলেন সান্ধ্য ভ্রমণে। একটু যেতে না যেতেই রাস্তার বাঁকের কাছে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখীন হলেন ঘোড়ায় টানা এক গাড়ির। ঐ গাড়ির মধ্যে ছিলেন দুই ভদ্রমহিলা। রাস্তার ধারে গ্যাসের আবছা আলোয় ঐ মহিলা দু'জন চিনে ফেললেন বিজ্ঞানীকে। আর অমনি বলে উঠলেন, 'নমস্কার, মিস্টার ক্যাভেণ্ডিশ।'

প্রতি নমস্কারটুকু না করেই ক্যাভেণ্ডিশ অমনি পিছু হাঁটা শুরু করলেন।

মহিলাদের সঙ্গে মিশতে না পারাটা ছিল বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিশের মানসিক অক্ষমতা!

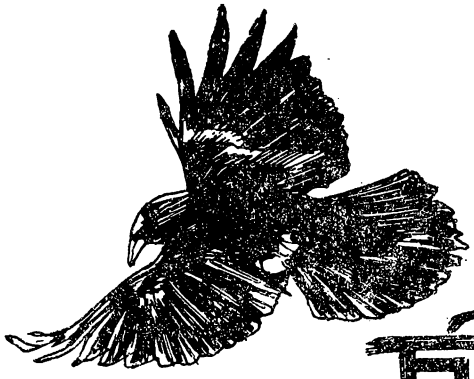

জাতিঙ্গার পাখি

অজয় হোম

জাতিঙ্গা কথাটি নাগা শব্দ। যার অর্থ হল, যেখান দিয়ে বাদল বাতাস বয়। দেশী-বিদেশী কাগজে বেশ কয়েক বছর ধরেই পড়ছি, উত্তর কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলে জাতিঙ্গা বলে একটা জায়গায় পাখিরা এসে আগুনে ঝাঁপ দেয়। এই জহরব্রতের কারণ খবরের মাধ্যমে পাই নি। তবে ভারত সরকারের 'ডিপার্টমেণ্ট অফ ট্যুরিজম' থেকে প্রকাশিত 'গুয়াহাটি কাজিরাগী মানস শিবসাগর' পুস্তিকায় হাফলং বিভাগে লেখা আছে, অন্ধকার রাতে গ্রামবাসীরা মশাল হাতে চললে সেই জ্বলন্ত আগুনের উপর পাখিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণস্বরূপ লেখা আছে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মশাল থেকে ইনফ্রা রে-র আলো বিচ্ছুরিত হওয়ার ফলে পাখিরা খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং সেইজন্যেই তারা আসে। আমার জানতে ইচ্ছে করে এই বিজ্ঞানীরা কারা। অসম্ভব ও অবান্তর। তাই যদি হবে তবে মশাল জ্বাললে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বা ভারতের অন্য কোনখানে তা কেন হয় না।

জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত এই নিয়ে 1972 সাল থেকে গবেষণা করছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর কাছে জানলাম একমাত্র আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-পশ্চিম বাতাস বইলে তার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও কুয়াশা হলেই তবে এই ঘটনা ঘটে। সব সময় হয় না। জাতিঙ্গা পল্লীর নানা অঞ্চলে প্রায় 13—14টি স্থানে আলো জ্বাললেই আসে। মশালের কোনো প্রয়োজন হয় না। হ্যাজাক বা অন্য কোন জোরালো বাতি জ্বাললেই আসে। এমনকি কিছু লোকের বাড়ির মধ্যেও আসে। যারা আসে তারা ঝিম মেরে পড়ে থাকে। খায় না, নড়ে না চড়ে না, পরে আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ডঃ সেনগুপ্তর ঘরে রেকটি-ফায়েড স্পিরিটের জারের মধ্যে ডোবানো যেসব পাখি দেখলাম, তা সবই নানা জাতের মাছরাঙার। শুনলাম, এছাড়া অন্য পাখিও আসে।

তারপর 5ই ফেব্রুয়ারি 1985 কামরূপ একস্প্রেস ধরে গুয়াহাটিতে গাড়ি বদলে লামডিং পৌঁছালাম 6ই ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা নাগাদ। সেখান থেকে হাফলং-এর শেষপ্রান্তে ট্যুরিস্ট লজে। এখান থেকে জাতিঙ্গা 9 মাইল।

প্রতিদিনই সকাল ও বিকেলে বার হই আর পাখির সন্ধান করি। এইভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যাদের দেখি তাদের বাদ দিয়ে 60টি ওখানকার এক পাখির তালিকা তৈরি করলাম।

বেশ কিছু বিভিন্ন ধরনের পাখির দর্শনলাভ হয়। যাদের দেখা পাওয়াটা ভাগ্যের কথা। একদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর জাতিঙ্গার রাস্তায় চলেছি আমাদের ট্যুরিস্ট লজ থেকে। তখন বেলা প্রায় 3-45 মিনিট। দেখি, একটা চকচকে কুচকুচে কালো পাখি পাথরের উপর বসে আছে। আর কয়েকটা ওড়াউড়ি করছে। কাকই, তবে এদের চঞ্চু সরু এবং ঈষৎ বাঁকানো, তার রঙ লাল আর পা দুটোও লাল। আমার অচেনা নয়। প্রথম

দেখি শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাবার পথে। বিকেলের দিকে ওড়াউড়ি করছিল। এদের নাম, লেপচা 'ডুম্বু' (পাইরহোকোরাস পাইরহোকোরাস হিমালয়ানাস), ইংরেজি—**রেডবিলড্ চাফ**। বায়স বংশের (কর্ভিদ) অন্তর্গত সুবর্ণকাক গণের (পাইর হোকোরাস) এক প্রজাতি। আর-একটি উপজাতি আছে পশ্চিম হিমালয়ে (পা পা সেণ্ট্রালিস)। যাদের দেখছি তাদের কণীনিকা গাঢ় পাটকিলে, পা ও আঙুল চঞ্চুর চেয়ে বেশি গাঢ় লাল, নখর কালো। লম্বায় 45 সেমি (17 ইঞ্চি)।

বাসস্থান— গাঢ়োয়াল ও কুমায়ুন থেকে পুবে নেপাল, দার্জিলিঙ জেলা, সিকিম, ভুটান, আসামের পার্বত্যাঞ্চল এবং অরুণাচলে 2400 থেকে 4900 মি. উচ্চতার মধ্যে।

খাদ্য—যাবতীয় পোকামাকড় ফলসা-বৈঁচি জাতীয় ছোটো ফল এবং বার্লির দানা। তবে জাতভাই হিমালয়ের হলদে চঞ্চু বা **আলপাইন ডাফদের** (পা গ্রাকুলাস ডিজিটাট্াস) মত মৃত মাংসভোজী নয়।

দলবদ্ধ হয়েই বাস করে। যেখানে বার্লিচাষ হয় সেইসব খেতের খুবই ক্ষতি করে। উঁচু পাহাড়ের গুহা, উঁচু পর্বতচূড়ার খাজ বা ফোকর এবং পার্বত্য বৌদ্ধ মঠ ইত্যাদির চূড়ায় বা আলসের ফোকরে। প্রজননকাল মার্চ থেকে মে।

একদিন গেলাম জাতিঙ্গা পাহাড়ের বাঁ পাশে মাহুর (23 কিমি) এবং লামডিং (104 কিমি) যাবার রাস্তায়। কাছেই পার্বত্য ডুলং নদীর ব্রিজ। সামনেই বরাইল পর্বত শ্রেণী। নদীটা নেমে ক্রমে সমতলের দিকে গেছে। ডানদিকে বরাইলের সর্বোচ্চ শিখর, সেখান থেকে পার্বত্য নালারূপে নেমে এসেছে ডুলং। এই ডুলং নালার ধার ধরে সংকীর্ণ পায়ে চলা পথ ধরে উপরে উঠতে লাগলাম। চারদিকে রডোড্রেনডনের ঝোপ, বুনো কলাগাছ, বুনো লতা, লানটানার ঝোপ, সাদা নাগকেশর, বুনো জবা, কমলা, আনারস ইত্যাদি গাছ ও ঝোপের জঙ্গল।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দেখলাম বাঁ দিকে ডুলং নালা পাঁচছয়েক ফুট উঁচু থেকে ঝর্ণা হয়ে উপর থেকে পড়ছে।

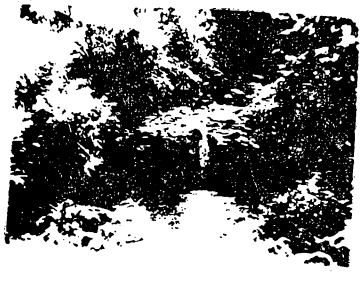

ডুলং নালার ঝরণা

যেখানে পড়ছে সেখানকার চ্যাপটা পাথর ক্ষয়ে গিয়ে দুতিন ফুট গভীর গর্ত হয়ে জল উপরে পড়ে ধাপে ধাপে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হল। জঙ্গলের আড়াল থেকে ঝর্ণাটার দিকে নজর রাখা যাবে। ওখানে পাখি আসবেই। আমি ওখানে পাথরের উপর বসে পড়ে ঝর্ণাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। যখনই সুবিধা হয়েছে তখনই এই জায়গায় এসে বসেছি।

এখানে বসে যেসব পাখি দেখেছি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'সীঙ্গে গিরদি' (রাইরাকার্নিস ফুলিগিনোসাম), ইংরেজি—**প্লামবিয়াস রেডস্টার্ট**। লম্বায় 12 সেমি (5 ইঞ্চি)। উড়ে এসে বসল একটা পাখি। পাখিটা পাথরের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাশ দিয়ে জল বয়ে ধাপে ধাপে নিচে নামছে। কপাল ও চাঁদির সামনে চওড়া করে সাদা। চোখের চারপাশ, মাথা ও ঘাড় কালো, পিঠ কালো, তার উপর সাদা ছিট ছিট, ডানায় ইংরেজি 'V' আকারে সাদা পটি সাদা বস্তিপ্রদেশে এসে মিশেছে। কালো লেজ গভীরভাবে চেরা সরু থেকে চওড়া, লেজের বাইরের পালক সাদা, লেজের উপরে গোটা তিনেক উলটো 'V' আকারের সাদা পটি। এই পাখির বাংলা-হিন্দি নাম নেই। ভুটানীরা বলে, 'চুকালেকা'। বাংলা নাম দিলাম—'ছিটে লেজচেরা' (এনিক্যুরাস মাসক্যুলাটাস গুট্টাটাস), ইংরেজি—**ইস্টার্ন স্পটেড ফর্কটেল**। লম্বায় 25 সেমি (10 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে।

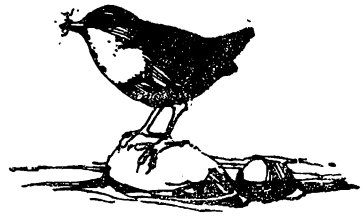

ব্রাউন ডিপার

বাসস্থান পূর্ব নেপাল থেকে পুবে অরুণাচল প্রদেশ, সেখানে থেকে দক্ষিণ মেঘালয়, উত্তর কাছাড়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম 600 থেকে 3000 মি. উচ্চতার মধ্যে। দেখা যায় গভীর জঙ্গলে পার্বত্য ছোটো স্রোতস্বতীতে এবং শীতে পাহাড়ের তলায় চওড়া নদীর বুকে।

ডাক—তীক্ষ্ণ চুম্বু 'ত্রিইটৎ সিউইক', কখনও কখনও দ্রুত 'চিইক-চিক-চিক-চিক'। এটা শোনা যায় বসা ও ওড়া দুই অবস্থাতেই।

খাদ্য - জলজ কীটপতঙ্গ ও ছোটো কম্বোজ।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে জুলাই। এদের বাসাতে পরভৃত কুকু (কুকুলাস ক্যানোরাস) ডিম পেড়ে যায়।

এটা উড়ে যাবার পরই এল, 'নীল সুন্দরী' (মুস্কিকাপা সানগরা সানডারা), ইংরেজি—**রুফাসবেলীড নীলটাভা**। পাখিটা তর্দাশ উপবংশের (টার্ডিনি) এক প্রজাতি। বাংলা-হিন্দি নাম নেই। আছে নেপালী 'নিলতাও,' লেপকা—মাংগংগ। তারপরেই এল—'পাহাড়ী ফিঙ্গা' (চাইমাররোবনিস লিউকোকেফালাস), হিন্দি—গিরচাওন্তিয়া, ইংরেজি—**হোয়াইটক্যাপড্ রেডস্টার্ট**। লম্বায় 19 সেমি (সাড়ে 6 ইঞ্চি)।

পাহাড়ী ফিঙ্গা উড়ে যাবার পর এল 'কালচে লেজচেরা' (এনিক্যুরাস শিচসটামিউস), ইংরেজি—**স্লেটিব্যাকড্ ফসটেল**। লম্বায় 25 সেমি (10 ইঞ্চি)। এরপরেই এক আশ্চর্য পাখি দেখলাম। বাংলা-হিন্দি নাম নেই। তাই নাম দিলাম — 'নু লি য়া পাখি' (সিনক্লাস পাল্লাসিয়ি দর্জি'ই) ই ং রে জি—**ইস্ট হি মা ল য়া ন ব্রাউন ডিপার**। পাখিটা এসে সেই দু'তিন ফুট যে জমা জল তার ধারে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে জলের মধ্যে ডুবে একটা পোকা ধরে এনে খেয়ে উড়ে চলে গেল নিচের দিকে। এর পরেই একটা পাখি এল। যার নাম দিয়েছি—সবজে ফুচি (ফাইল্লোসকোপাস ট্রোচিলয়ডেস), ইংরেজি—**ইস্টার্ন গ্রীনিশ লিফ-ওয়ার্বলার**। লম্বায় 10 সেমি (4 ইঞ্চি)।

হিটে লেজ চেরা

এর মধ্যে বেশ কদিন জাতিঙ্গায় গিয়েছি। জাতিঙ্গার উচ্চভূমিতে ওঠার মুখেই একটা শ্বেতপাথরের মূর্তি আছে জাতিঙ্গা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত লাখোন বাংগ সুচিয়াং-এর। গ্রামবাসী তাঁর স্মরণে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 1905 সালে মেঘালয়ের জয়ন্তীয়া—জোয়াই অঞ্চল থেকে এই ভদ্রলোক এসে পাহাড়ের উপর এই গ্রাম পত্তন করেছিলেন। সেই 1906 সাল থেকে প্রতি বর্ষার সময় পাখিরা আজও আসছে। কখনও কম কখনও বেশি।

জাতিঙ্গা কচ্ছপের পিঠের মতো উচ্চভূমি। উচ্চতা 2500 ফুট। একপাশে পাহাড় উত্তরদিকে নেমে গেছে ডুলং নদীতে গিরিখাতের মধ্যে। দক্ষিণে পিছনদিকে নেমে গেছে সোট হিল স্টেশন জাতিঙ্গা পার হয়ে জাতিঙ্গা নদীতে। ডুলং নদীর পিছন দিকে উঠেছে বরাইল পর্বতমালা। তার সর্বোচ্চ শিখর হেম্পিও 6200 ফুট।

হিল স্টেশন জাতিঙ্গা থেকে গাঁয়ের হেলথ সেণ্টার দেড় মাইলটাক হবে। পাখিরা বর্তমানে এই পথে আসে। ঐ রকম হাওয়া, ঝির ঝিরে বৃষ্টি ও কুয়াশা হলেই তবে পাখিরা আসে। আলোর কাছে এসে তারা অবশ হয়ে মাটিতে পড়ে। যে কদিন ঐ অবস্থায় না খেয়ে বাঁচে ততদিন মৃতপ্রায় অবস্থায় থাকে। ঐ অবস্থায় তাদের দূরে শিলং-এর পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও তাদের ঘোর কাটে নি।

এই ঘটনা প্রথম ঘটে 1885 খ্রিস্টাব্দে। কিছু জেমি নাগা সম্প্রদায়ের লোক হাফলং-এর কাছ থেকে এই জাতিঙ্গায় এসেছিল ঝুম চাষের জন্যে। রাতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে আগুন জ্বালিয়ে তাপ পোহাচ্ছিল দেখে যে বেশ কিছু পাখি উড়ে এসে আগুনের ধারে পড়ছে। তারা ভৌতিক ব্যাপার ভেবে ভয় পেয়ে যায়। শেষে জায়গাটা লাখোন বাংগ সুচিয়াং-কে মাত্র 25 টাকায় বিক্রি করে দেয়।

সুচিয়াং ও তাঁর খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বী আত্মীয়স্বজনরা এই আধিভৌতিক ব্যাপার বিশ্বাস করেন না। তাঁদের কাছে এটি সহজলভ্য প্রোটিন খাদ্যভাণ্ডার। এর ফলে প্রতিবছর শত শত পাখি মৃত্যুমুখে পড়তে লাগল। অবশেষে বর্তমানে আসাম সরকারের আনুকূল্যে 'পাখি বাঁচাও সংস্থা' ও স্থানীয় ছেলেদের কল্যাণে মৃত্যুর হার কমের দিকে এবং স্থানীয় অধিবাসীরাও সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাঁরা চান না বাইরের লোক এসে এখানে মাতব্বরী করুক।

জাতিঙ্গার পাখিদের এই রকম অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ কি? এটা কি এইসব প্রাকৃতিক দিনের পাখিদের মধ্যে বিপাকক্রিয়া বেড়ে যাওয়ার ফলে ঘটছে? বিকার-তত্ত্বীয় ও শারীরবৃত্তীয় গবেষকরাই বলতে পারবেন এই অবস্থার ফলে প্রাথমিক জননগ্রন্থির উপর হরমোনের প্রভাব পড়ছে কিনা যখন পাখিরা ঘোরের মধ্যে থাকে। ভবিষ্যৎ বিশারদদেরও প্রয়োজন যাঁরা হেলথ সেণ্টার ও জাতিঙ্গা হিল স্টেশনের মধ্যে বাতাসে তেজস্ক্রিয়ের পরিমাণ মাপতে সক্ষম হবেন। এই ঘটনার সময় তার প্রভাব স্থানীয় লোকেদেরও উপর পড়তে দেখা যায়। তাঁরা শ্বাসকষ্ট ও অলীক কল্পনার মধ্যে পড়েন। এইসব কারণে আমার মনে হয় ভালো ল্যাবরেটরি খাড়া করে এই রহস্য ভাঙা উচিত। যেভাবে চলছে তাতে বিশেষ কিছু হবে বলে মনে হয় না।

ডুগং

অমরনাথ রায়

সাগরের জলে অতি ক্ষুদ্র হ'তে অতি বিশাল বিচিত্র সব প্রাণী আছে। চেহারায় কারুর সঙ্গে কারুরই কোন মিল নেই। চালচলন ও স্বভাবও তাদের আলাদা।

ডুগং সাগরেরই এক বাসিন্দা। চালচলনে মাছের সঙ্গে মিল থাকলেও 'ডুগং' কিন্তু মাছ নয়, মাছের জ্ঞাতি-ভাইও নয়। মানুষ, গোরু প্রভৃতি প্রাণীর মতই এ এক স্তন্যপায়ী জীব। এদের বাচ্চা হয় এবং বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করেই বড় হয়। ডুগংকে অনেকে তাই সামুদ্রিক গাভী (Sea Cow) আখ্যা দিয়ে থাকেন।

স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও ডুগং এর পিছনের পা নেই। সামনের পা দু'টি আছে বটে কিন্তু তাও মাছের পাখনার আকার ধারণ করেছে। বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার সময় মা তাকে এই পাখনা দু'টি দিয়ে জড়িয়ে ধরে এবং জলের উপরে মাথাটি খাড় অবস্থায় রাখে। বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতেই ওরা জলে ভেসে চলে। দূর থেকে তখন দেখলে মনে হয়, কোন মানুষ-মা বুঝি তার সন্তানকে খাওয়াচ্ছে।

আগেকার দিনে এই ডুগংকে দেখেই অনেকে 'মৎস্য-কুমারী' বলে ভাবতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সমুদ্রে এক জাতের মানুষ বাস করে, যাদের দেহের উপর দিকটা মানুষের মত ; আর নিচের দিকটা মাছের মত। এই বিচিত্র দর্শন প্রাণী বা মৎস্য-কুমারী নিয়ে অনেক আজগুবি কাহিনীও প্রচলিত হয়েছিল সেকালে।

সমুদ্রের জল যেখানে গভীর, ডুগং সেখানে যায় না। অগভীর সাগর জলেই এই প্রাণীদের বাস। অনেক হিংস্র জন্তুর সঙ্গে বাস করলেও ডুগং কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির নয়। এরা খুবই নিরীহ প্রাণী। এরা নিরামিশাষী। শ্যাওলা ও এ জাতীয় অনেক জলজ উদ্ভিদ এদের প্রধান খাদ্য।

ডুগংরা মুখে এক রকম শব্দ করে। দূর থেকে তা বাঁশি বা সাইরেনের একটানা শব্দ বলেই ভ্রম হয়। বিজ্ঞানীরা তাই ডুগং শ্রেণীর প্রাণীদের নাম রেখেছেন 'সাইরেনিয়া'।

নীল সায়রের এই আজব বাসিন্দাদের বংশ নানান্ কারণে বর্তমানে লোপ পেতে বসেছে। এখন ডুগং হ'য়ে পড়েছে এক দুর্বল প্রাণী। প্রাণীবিজ্ঞানীরা তাই এখন এদের সযত্নে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

সুবোধ ব্রাদার্স

দার্জিলিং চা

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট

কলকাতা

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

KJB/MAY/87/6

ওঃ, তুই মানবিকতা দেখাতে এসেছিস! এ হচ্ছে কৃত-কর্মের ফল। মৃত্যু।
—'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'— এ তো কবিতাতেই আছে। মৃত্যুর হাত থেকে কারোর নিস্তার নেই।
ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের সবাইকে যে তিলে তিলে মরতে হবে, তার কথাই আমি বলছিলুম!
কোন জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী এটা?
না ব্রাদার, এ কোন জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী নয়। এ হল বৈজ্ঞানিকদের ভবিষ্যৎ বাণী, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর!
তাই নাকি! তাহলে আর দেরী না করে চল্, দুটাকার ঝাল মুড়ি কিনে খাওয়াবি। বলা যায় না কখন কি হয়!
মানে আমার কথা বোধগম্য হল না, এই তো? পরিবেশদূষনের নাম শুনেছিস?
পরিবেশ হল যেখানে আমরা বাস করি, তার আশপাশ। আর দূষণ হল–
যেই খাওয়ানোর কথা উঠলো, অমনি ভুজুংভাজাং দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা।
MAY-87
ভেরি গুড্। এদিকে আয়, দ্যাখ!
ওদিকে তাকা!
চল, এবার সামনের দিকে তাকা!

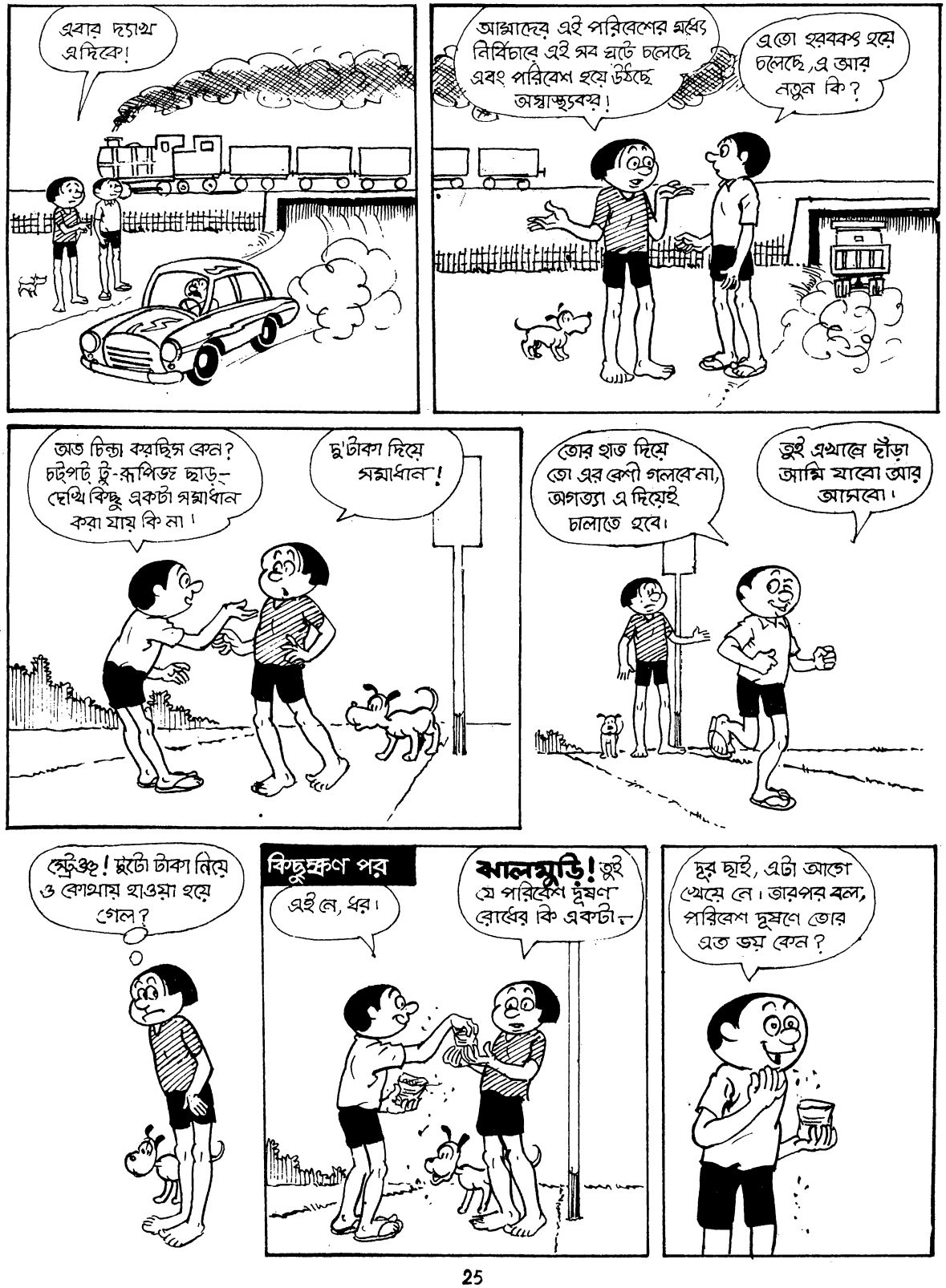
এবার দ্যাখ এদিকে!
আমাদের এই পরিবেশের মধ্যে নির্বিচারে এই সব ঘটে চলেছে এবং পরিবেশ হয়ে উঠছে অস্বাস্থ্যকর!
এতো হরবকত হয়ে চলেছে, এ আর নতুন কি?
অত চিন্তা করছিস কেন? চটপট্ টু-রূপিজ ছাড়্- দেখি কিছু একটা সমাধান করা যায় কি না।
দু'টাকা দিয়ে সমাধান!
তোর হাত দিয়ে তো এর বেশী গলবে না, অগত্যা এ দিয়েই চালাতে হবে।
তুই এখানে দাঁড়া আমি যাবো আর আসবো।
স্ট্রেঞ্জ! দুটো টাকা নিয়ে ও কোথায় হাওয়া হয়ে গেল?
কিছুক্ষণ পর
এই নে, ধর।
ঝালমুড়ি! তুই যে পরিবেশ দূষণ রোধের কি একটা-
দূর ছাই, এটা আগে খেয়ে নে। তারপর বল, পরিবেশ দূষণে তোর এত ভয় কেন?

আ-মোলোয়া!
ভয় কি শুধু আমার নাকি?
আমার তো মনে হয় ভয়টা তোরই বেশী হচ্ছে।
চোর নয়, ডাকাত নয়, ভূত নয়-ভয় তোর পরিবেশ দূষণে! ঝালমুড়িটা খা, একটু স্থির হবি।
একেই বলে হেঁড়ে মাথার বুদ্ধি! শোন— এই যে গাছপালা কাটছে, কলকারখানা রেল-ইঞ্জিনের ধোঁয়া, শহরের নানা নোংরা বিষাক্ত জল নদীতে পড়ছে—
হ্যাঁ পড়ছে এবং এই বিশাল পৃথিবীর পঞ্চভূতে মিশে যাচ্ছে।
শুধু মিশে যাচ্ছে না—পৃথিবীর আবহাওয়া-বাতাস-জল বিষাক্ত করে তুলছে। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ফলে— নানা জটিল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, অকাল মৃত্যু, শিশু মৃত্যু এমন কি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে!
এর একমাত্র সমাধান— পৃথিবী জুড়ে একটা স্ট্রাইক ডাকা। তাহলে কল-কারখানা গাড়ি ঘোড়া কিছুই চলবে না ফলে পরিবেশও দূষিত হবে না!
তুই একটা গাড়ল! এটা সমাধান হল? এতে যে সভ্যতার অগ্রগতিই বন্ধ হয়ে যাবে! সুতরাং প্রগতির সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে উপযুক্ত পরিবেশ সচেতনতা, যার দ্বারা প্রাকৃতিক ভার-সাম্য রক্ষিত হবে
জনসাধারণের মধ্যে এই সচেতনতা গড়ে তোলা মুখের কথা নয় চাঁদ!
জেনে রাখ, ইতিমধ্যে এ নিয়ে চারিদিকে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। তোর মত কিছু লোক বাদে!
কি আমাকে বললাম! ঝালমুড়ি খাইয়েছিস বলে যা ইচ্ছে তাই বলবি! ভেবেছিস কি?
এই ছেঁচে করে তুই আবার সেই পরিবেশ দূষণ করে ফেলছিস! একে বলে শব্দ দূষণ
ঠিক আছে- উপস!
আঃ হা, অতটা নয়! এই জন্যই সবেতে সচেতনতা দরকার! তাহলেই হবে।

ইলেকট্রনিক্স্-এর গোড়ার কথা

বিপ্লব ব্যানার্জী

ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা করার আগে পদার্থের গঠন ও প্রকৃতির উপর খানিকটা নজর দেওয়া যাক। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থাকে আমরা বলি অণু (Molecule)। আগে ধারণা ছিল পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম কণাকে আর বোধ হয় ভাঙা সম্ভব নয়। কিন্তু 1808 খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ বিজ্ঞানী জন ডালটন কতকগুলি রাসায়নিক সংযোগ সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখলেন যে প্রতিটি অণুই আবার এক বা একাধিক কণা দ্বারা গঠিত এবং তিনি এই সূক্ষ্মতম কণার নামকরণ করলেন Atom বা পরমাণু। কণা-পদার্থ বিজ্ঞানে একটা নূতন দিগন্ত খুলে গেল, সৃষ্টি হল পরমাণুবাদ। হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে 104টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই পরমাণুবাদ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কাজেই পরমাণু হল পদার্থের শেষ স্বাধীন ক্ষুদ্রতম অবস্থা যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানী এর উপর নানাবিধ গবেষণা চালিয়ে গেলেন। অবশেষে 1880 খ্রীস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্ একটি কাচনলকে প্রায় বায়ুশূন্য করে (0·01 m. m. পারদ চাপে) দুটো তড়িৎদ্বার ঢুকিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলেন। ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড) থেকে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার (অ্যানোড)-এর দিকে একটা রশ্মি সরলরেখায় নির্গত হতে দেখা গেল। এই নবআবিষ্কৃত রশ্মির নাম ক্যাথোড রশ্মি বা Cathode ray। শুরু হয়ে গেল ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা। এদিকে 1881 সালে প্রকাশিত J. J. Thomson-এর একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা অনেকের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অন্যদিকে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের তিন অবস্থার কারোর সঙ্গে কোন রকম মিল খুঁজে না পেয়ে শেষমেশ ক্রুকস্ একরকম হঠাৎই Cathode রশ্মিকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ "forth state of matter" বলে অভিহিত করলেন। Plasma-Physics নামক পদার্থ বিজ্ঞানের একটি দিগন্ত প্রসারী শাখা জন্ম নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। ক্রুকস্-এর প্রায় সমসাময়িক বিজ্ঞানী Jean B. Perrin এই রশ্মিকে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত অতি ক্ষুদ্র কণার স্রোত ছাড়া যে আর কিছুই নয়, এই ধরনের কিছু মত প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন। অন্যদিকে Thomson-এর ভাগ্য আরও সুপ্রসন্ন হল। তদানীন্তন Cambridge University-র জগৎ বিখ্যাত Cavendish Laboratory-র Director পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ পদে আসীন হলেন J. J. Thomson, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠাশ বছর। Thomson Cathode রশ্মির উপর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন এবং 1897 খ্রীস্টাব্দে সঠিকভাবে প্রমাণ করলেন যে ক্যাথোড রশ্মি বস্তুতপক্ষে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত অতি ক্ষুদ্র কণিকার প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি এর নামকরণ করলেন Electron, আর এই Electrons-ই হল Electronics নামক পদার্থ বিজ্ঞানের সুবৃহৎ শাখার যাবতীয় চাবিকাঠি। Thomson মতবাদের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী যুগে F. W. Aston Mass Spectrograph যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছাড়াও যে কোন মৌলিক পদার্থের এক বা একাধিক আইসোটোপের অস্তিত্বের কথা Thomson-ই সর্বপ্রথম সঠিক ব্যাখ্যা করলেন। বড় কাজের বড় পুরস্কার। Thomson কে পদার্থ বিজ্ঞানে 1906 সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হল। জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যাদারফোর্ডের নাম তোমরা হয়ত অনেকেই শুনেছ, উনিও ছিলেন স্যার টমসনের অত্যন্ত স্নেহের এবং খুব কাছের একজন সুযোগ্য ছাত্র। টমসন কতবড় বিজ্ঞানী ছিলেন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীকালে টমসনের ছয় ছয়জন সুযোগ্য ছাত্রের নোবেল পুরস্কার লাভের সফলতার মধ্য দিয়ে। স্মরণ করা যেতে পারে যে তাঁর পুত্র G. P. Thomsonও 1937 সালে নোবেল পুরস্কার পান। 1911 খ্রীস্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী Millikan পরীক্ষা করে দেখালেন যে ইলেকট্রন নামক ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণার আধান বা চার্জ—$e = 4{\cdot}8 \times 10^{-10}$ esu (esu = ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিট) বা $1{\cdot}6 \times 14^{-19}$ কুলম্ব। কাজেই একটা ইলেকট্রনের চার্জই হল তড়িতের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম একক। এরপর মিলিকান, টমসনের সহযোগিতায় বিশ্ববিখ্যাত "Oil Drop Experiment" করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন যে একটি ইলেকট্রনের ভর হল $9{\cdot}11 \times 10^{-28}$ গ্রাম যা একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর

ভরের $\frac{1}{1836}$ ভাগ। ইলেকট্রন কণা আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা পরমাণু মধ্যস্থিত অন্যান্য কণার অস্তিত্বের উপর বেশি করে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করলেন। তার প্রধান কারণ হল একটি পরমাণু সামগ্রিক ভাবে নিস্তড়িৎ অবস্থায় বিরাজ করে, অর্থাৎ একটি পরমাণুর মোট আধান বা চার্জ হল শূন্য। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আরও অনেক পরীক্ষা চালিয়ে 1886 খ্রীস্টাব্দে গোল্ডস্টাইন নামে এক জার্মানের বিজ্ঞানী ক্যাথোড রশ্মির মত আরও এক ধরনের রশ্মির সন্ধান পেলেন যা ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণার সমষ্টি। বিজ্ঞানী Thomson আর সাত পাঁচ চিন্তা ভাবনা না করে সোজাসুজি এর নামকরণ করলেন positive রশ্মি বা positive ray। কিছু সময় পরে আরও অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানী মিলে এর নামকরণ করলেন প্রোটন। যার ধনাত্মক আধান হল $1{\cdot}6\times10^{-19}$ কুলম্ব এবং ভর হল $1{\cdot}6725\times10^{-24}$ গ্রাম। একটি প্রোটনের ব্যাসার্ধ হল আনুমানিক 10^{-13} cm. হাইড্রোজেন পরমাণুকে আরও ভালভাবে জানার রাস্তা আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে গেল। এক পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট হাইড্রোজেনই হল সবচেয়ে সহজ ও সরলতম পরমাণু যা মাত্র একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন দ্বারা তৈরি। 1930 খ্রীস্টাব্দে Booth ও Baker বেরিলিয়াম নামক এক ধাতুর উপর তীব্র গতিসম্পন্ন আলফা রশ্মি চালনা করে একটি নূতন রশ্মির সন্ধান পেলেন যা যে কোন আধানযুক্ত তড়িৎক্ষেত্র বা চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা কোনভাবেই আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয় না আর এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা অতি সহজেই বুঝতে পারলেন বস্তুতপক্ষে নূতন ঐ রশ্মিটি অসংখ্য নিস্তড়িৎ কণিকার সমষ্টি ছাড় আর কিছুই নয়। 1932 খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী স্যাডউইক কণাগুলিকে 'নিউট্রন' নামে অভিহিত করলেন যার ভর $1{\cdot}675\times10^{-24}$ গ্রাম এবং ব্যাসার্ধ হল $1{\cdot}5\times10^{-13}$ cm। বোঝা গেল নিউট্রন হল শূন্য আধানযুক্ত একটি কণিকা যা প্রোটনের ভর অপেক্ষা সামান্য একটু বেশি। ক্রমান্বয়ে Geiger এবং Marsden 1909 সালে এবং Ernest Rutherford 1911 সালে একটি প্রায় বায়ুশূন্য কাচনলে 0 0004 mm. বেধবিশিষ্ট পাতলা সোনার চাদরের উপর আলফা কণিকা দ্বারা সংঘাত ঘটিয়ে সঠিকভাবে প্রমাণ করলেন পরমাণুর অভ্যন্তরের বেশির ভাগ স্থলেই একেবারে ফাঁকা ময়দান যার কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন ও নিউট্রন এবং তার চারিদিকে ইলেকট্রনগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। অনেকটা তরমুজের ভিতরের বীচিগুলি যে ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সেইরকম আর কি! এভাবে আরও জানা গেল যে কেন্দ্র যা নিউক্লিয়াসের ব্যাস হল আনুমানিক 10^{-12} cm, আর পুরো একটা পরমাণুর ব্যাস হল 10^{-8} cm অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্র অধিকৃত স্থানের মাপ হল পুরো পরমাণুর 10 হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে একটা পরমাণু যার কেন্দ্র +vely charged এবং কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন যা –vely charged, কিভাবে পরস্পর সহযোগিতা করে আছে। এর উত্তর হল ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনে উদ্ভূত কেন্দ্রাতিগ বল বা centrifugal force। একটা সুতোর এক প্রান্তে একটা ছোট পাথরের টুকরো বেঁধে এবং সুতোর অপর প্রান্ত আঙুলে পেঁচিয়ে ঘোরালে যে জিনিসটা ঘটে অনেকটা ঠিক সেইরকম. নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ইলেকট্রনগুলি ঘুরছে K, L, M N, O, P ইত্যাদি বিভিন্ন কক্ষপথে, এই কক্ষপথগুলিকে বলা হয় ইলেকট্রন খোল বা shell। প্রত্যেকটি কক্ষপথে আবার সর্বাধিক ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ণীত হয় $2n^2$ সূত্রানুসারে। প্রত্যেকটি shell আবার s, p, d, ও f এই চারটি subshell-এ বিভক্ত। নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের কক্ষপথটিকে বলা হয় K-shell এবং এই K-shell-এ n-এর মান হল এক। কাজে কাজেই K, L, M, ...ইত্যাদি shellগুলোতে ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ সংখ্যা যথাক্রমে 2, 8, 18, 32,.....ইত্যাদি। যেহেতু সামগ্রিকভাবে, একটি পরমাণু নিস্তড়িৎ অবস্থায় বিরাজ করে, সেই হিসাবে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে মোট প্রোটনের সংখ্যা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান মোট ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান। আবার একটি পরমাণুর ভর সংখ্যা বলতে বোঝায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মোট প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলের সমষ্টি অন্যদিকে কোন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বা Atomic number বলতে বোঝায় ঐ মৌলের নিউক্লিয়াসে মোট প্রোটনের সংখ্যা। এই হল পরমাণুর মোটামুটি গঠন বৈচিত্র্য যার সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র Quantum Theory দ্বারাই সম্ভব। কাজেই বস্তু হল কতকগুলি অণুর সমষ্টি যাকে ভাঙলে পাওয়া যায় পরমাণু। প্রত্যেক পরমাণু আবার যথাক্রমে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন এই তিন ধরনের অপরিহার্য মৌলিক কণা দ্বারা সৃষ্ট। কেবলমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুই একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রোটন দ্বারা উৎপন্ন। কাজেই ইলেকট্রনগুলিই হল সকল পদার্থের এক সাধারণ উপাদান। পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনকে ভেঙে আরও তিনটি নূতন কণার সন্ধান পান যাদের নামকরণ হল যথাক্রমে পজিট্রন, অ্যান্টি প্রটোন ও নিউট্রিনো। এদিকে হিডেকি য়ুকাইয়া 1935 সালে এবং Anderson ও Neddermeyer 1936 সালে Cloud-Chamber দ্বারা Cosmic ray-র ফটো তুলতে গিয়ে প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী একটি কণিকার সন্ধান পান। মধ্যবর্তী এই কণিকার নাম 'মেশন'। 1948 সালে cyclotron মেশিন দ্বারা কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রকে অতি উচ্চ গতিসম্পন্ন আলফা কণিকাদ্বারা আঘাত করে কণাবিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে 'মেশন' কণিকা তৈরি করতে সফলকাম হন। এরপর মেশন কণিকাকে ভেঙে যথাক্রমে

pions ও muons তৈরি করা সম্ভব হল এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আরও অনেক নূতন নূতন কণিকা যেমন Leptons, Kaon. Hadron প্রভৃতির সন্ধান মিলল। কিন্তু এরা সবাই খুব ক্ষণস্থায়ী কণিকা যাদের অর্ধজীবন বা Half life 10^{-15} to 10^{-8} সেকেণ্ডের মধ্যে। যেমন 10 গ্রাম পরমাণুর ভেঙে গিয়ে 5 গ্রাম হতে যে সময় লাগে সেটাই হচ্ছে তার half life period বা অর্ধজীবন। বর্তমান জগতে সবচেয়ে দ্রুতগামী কণিকার নাম হল Tachaon (ট্যাকয়েন) যার গতিবেগ আলোর গতিবেগ থেকেও বেশি। এতসব কণিকার মধ্য থেকে ইলেকট্রন কণিকার দিকে আবার একটু ফিরে তাকানো যাক। কারণ এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান জগতের একটি সুবৃহৎ শাখা ঃ "Electronics" যার নাম। Electronics-এর জন্যই মানুষের চাঁদে নামা সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে Radio' T. V, Satelite, Super Computer, Rader প্রভৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা। "আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অবদান" সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রতি পদক্ষেপেই "Electronics"-এর দানের কথা বলতে হবে, বলতে হবে Electronics-এর বিশাল বিশাল ক্রিয়াকাণ্ডের কথা। এককথায় আধুনিক যুগ হল "Electronics"-এর যুগ। পদার্থের মধ্যে Electrons নামক কণিকার গতিবিধিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে শাস্ত্র গড়ে উঠেছে এবং যার সাহায্যে বর্তমান জগতের বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে তাকেই বলা হয় "ELECTRONICS"।

17, যাদব ঘোষ রোড, কলকাতা-61

বিচিত্র সংবাদ

শুভাশিস্ ঘোষ

বিচিত্র মাছ

দক্ষিণ আমেরিকার ছোটো নদীতে পুটি মাছের মত বিচিত্র এক ধরনের মাছ পাওয়া যায়। এদের নাম নিওন টেট্রা, জলের খুব গভীরে এদের বাস। এই মাছের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হল এদের পৃষ্ঠদেশে কখনও আলোর রেখা পড়লে দেহের নীল রেখা থেকে ঠিক নিয়ন আলোর মত আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। তবুও আলো এরা সহ্যই করতে পারে না। ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এরা।

বোবা পাখি, বোবা কুকুর

পাখিরা কথা বলে, গান গায়। কিন্তু পাখিরূপে জন্মেও বোবা হবার দুর্নামটা কেবলমাত্র সারসের। রেগে গেলে এরা শুধু লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঠক ঠক আওয়াজ করে। সারসের আদি বাসস্থান হল মেক্সিকো এবং আর্জেন্টিনা। পক্ষী বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন জ্যাবিরু। বোবা সারস পাখির মতই বোবা এক ধরনের কুকুরের বাস মিশরে। রেগে গেলে তাদের অভিব্যক্তি কেবল গোঁ গোঁ আওয়াজে।

ওয়াশিংটন ও শুক্রবার

জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনে শুক্রবার এর গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। কেননা, তিনি জন্মেছিলেন শুক্রবারে। সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন শুক্রবারে। শুক্রবারেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আরও অবাক হবার বিষয় তিনি এই পদ থেকে অব্যাহতি পান ওই শুক্রবারেই।

জানা-অজানা

শুভাশিস্ ঘোষ

সূর্যমুখী কেবলমাত্র সৌন্দর্যের জন্যই আমাদের কাছে প্রিয় নয়। ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যায় আমাদের জীবনে তার অবদানও অনেক। এর তৈলবীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তাতে আছে প্রচুর ভিটামিন B কমপ্লেক্স। এছাড়া আছে ক্যালসিয়াম প্রোটিন। রক্তে কোলেস্টরলের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা হৃদযন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নিয়মিত ভাবে সূর্যমুখীর তেল ব্যবহার করলে হৃদরোগের কোন আশংকা নেই।

* * *

আপেল আর পেয়ারা অনেকে বলবে এর মধ্যে আপেলই বেশি উপকারী। কিন্তু না। দামী আপেলের চাইতে কম দামী পেয়ারার খাদ্যগুণ অনেক বেশি। দু জনেই অবশ্য কার্বোহাইড্রেট দেয়। কিন্তু যেখানে 100 গ্রাম আপেলে ভিটামিন সি আছে মাত্র দুই মিলিগ্রাম, সেখানে 100 গ্রাম পেয়ারায় তা আছে 212 মিলিগ্রাম।

* * *

অনেকের ধারণা—গরুতে মুড়িয়ে খায় বলেই মাঠের ঘাস মাথা তুলতে পারে না। কিন্তু একদল বিজ্ঞানী যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে বলেছেন অন্য কথা। তাদের অভিমত ঘাস, আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে তার বেশির ভাগ অংশই থাকে তৃণভোজী জন্তুর লালাতে। তাই গরু ছাগলে মাঠের ঘাস খেয়ে ফেললেও ঘাসেরা এ থেকে লাভ করে বেশির ভাগ জীবনী শক্তি। এ বিষয়ে কলেরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এখনও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা-35

পরিচিত উদ্ভিদ পানিফল

অসীম হালদার

গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে বিশেষতঃ ভারতবর্ষের গ্রাম গ্রামান্তরের পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর সময় চারপাশের পুকুর খাল বিল প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয়ে যে জলজ উদ্ভিদটিকে প্রায় সব সময়ই লক্ষ করা যায় সেটি হল এই পানিফল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই পানিফল গাছের নাম 'ট্রাপা বিস্‌পিনোসা' (Trapa Bispinosa)। যেহেতু ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে এর মোটামুটি অবস্থিতি, সেহেতু এক এক অঞ্চলের লোকের কাছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এ গাছের নাম 'শৃঙ্গটকম্' হিন্দিতে 'সিংগরহা'। তেলেগু ভাষাভাষীদের কাছে 'কুবায়াকম', তামিল ভাষায় 'সিংগারাকোটাই' মালয়ালম ভাষায় 'করিমপোলা' এবং আমাদের বাঙালীদের কাছে এই উদ্ভিদটি পানিফল নামে পরিচিত। ইংরেজীতে এ গাছের নাম 'ওয়াটার চেস্টনাট'।

আগেই বলেছি পানিফল উদ্ভিদটি সম্পূর্ণভাবে জলজ উদ্ভিদ। বদ্ধ জলাশয়ে প্রাপ্ত এই উদ্ভিদটির দৈহিক গঠন লক্ষ করলে দেখা যাবে এটি সাধারণত বীরুৎ শ্রেণীর উদ্ভিদ। জলজ উদ্ভিদ বলে এদের দেহমূল সাধারণত উন্নতমানের হয় না। কাণ্ড সাধারণত নরম, এবং এই কাণ্ড বা দেহের গোড়া থেকে পানিফল উদ্ভিদের পাতা বের হয়। পাতাগুলির নিচের দিকটা সরু এবং উপরের দিকটা ক্রমশ চওড়া হয়ে গিয়েছে। এই উদ্ভিদের দেহ বা কাণ্ড থেকে লক্ষ করা যায় একটি চওড়া থলি বা ব্লাডারের মত অংশ বের হয় এবং এটি উদ্ভিদটিকে জলে ভাসিয়ে রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। পাতার উপরিভাগ সাধারণত হয় স্থূল ও তৈলাক্ত এবং এগুলি জলে ভেসে থাকে। পানিফল উদ্ভিদের ফল অর্থাৎ পানিফলের দেহত্বক সাধারণত স্থূল এবং এই স্থূল দেহত্বক থেকে দুটি কাঁটা সামনের দিকে বাড়ানো থাকে। ফলটি দেখতে মোটামুটি ত্রিকোণাকৃতি। এর রঙ সাধারণত বাদামী বা কালো রংয়ের হয়। ফলটির উপরিভাগ শুষ্ক হলেও ভেতরের শ্বাসত্বক বা কারনেল (Karnel) টি রসালো এবং শ্বেতসার যুক্ত হয়।

আম, জাম, কলা বা অন্যান্য ফলের খাদ্যমূল্য বা ফুড ভ্যালুর পাশাপাশি পানিফলের খাদ্য মূল্য তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও তা নেহাৎ কম নয়। একটি পানিফলের খাদ্য মূল্য বিচার করলে দেখা যাবে এটিতে প্রায় 70 শতাংশ জলীয় অংশ, 8·9 শতাংশ প্রোটিন, 0·3 শতাংশ ফ্যাট, 1·1 শতাংশ খনিজ দ্রব্য। 23·9 শতাংশ কার্বোহাইড্রেট, 0·02 শতাংশ ক্যালসিয়াম, 0·15 শতাংশ ফসফরাস এবং 0·8 শতাংশ আয়রন বা লোহা বর্তমান। সুতরাং বুঝতেই পারা যাচ্ছে ফল হিসেবে এটি নেহাৎ ফেলনা নয় আমাদের কাছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও পানিফলের সমধিক কদর রয়েছে অন্যান্য উদ্ভিদের মত। আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে পানিফল দেহের পিত্ত এবং রক্তের নানা দোষনাশক। এ ফলের জৈব উপাদানগুলি দেহের ক্লান্তি হরক এবং ক্ষুধাবর্ধক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় ঘি তৈরি করতে আয়ুর্বেদজ্ঞগণ এ ফলটিকে অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন।

পূর্ব কোদালিয়া (লিচু বাগান) পোঃ নিউ বারাকপুর জেলা 24 পরগনা (উত্তর)।

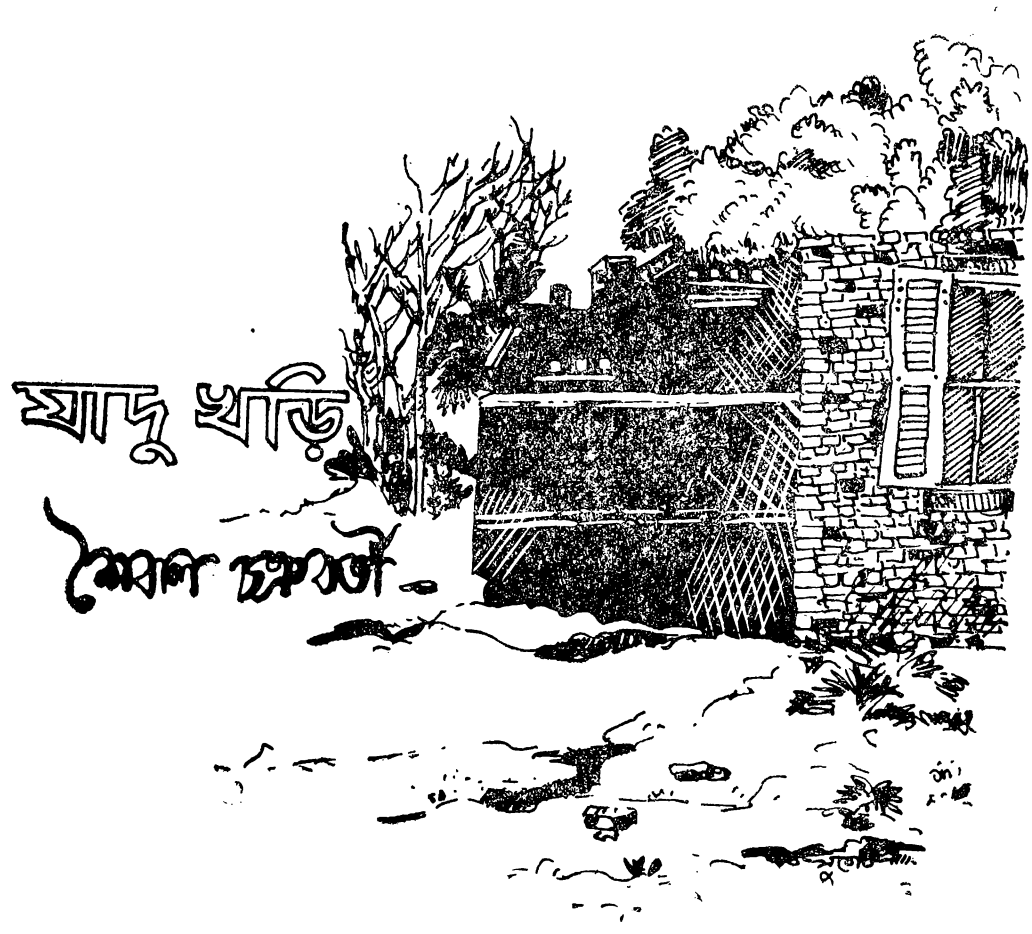

প্রফেসর হারাধন হালদার ঠিক সাধারণ জাতের বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। ফিজিক্সে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট এবং ম্যাসাচুসেটস থেকে হিমালয়ের ফসিলের ওপর গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. তো তিনি পেয়েছিলেনই। কিন্তু সেরকম বৈজ্ঞানিক তো গণ্ডায় গণ্ডায় আছেন। সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁর বড় পার্থক্য যেখানে সেটা হল তার ঈশ্বর ভক্তি। বৈজ্ঞানিক হয়েও প্রফেসর হালদার বিশ্বাস করতেন এমন কিছু শক্তি আছে যা বিশ্বসংসারের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর বন্ধু বা সহযোগীরা এই বিশ্বাসের কথা শুনে মুখ টিপে হাসতেন এবং বলতেন এটা একেবারেই অবৈজ্ঞানিকোচিত। তবু উপহাস এবং বিদ্রূপে প্রফেসর হালদারকে টলানো যায়নি। নিয়মিত গবেষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সকাল সন্ধ্যার ধ্যান, জপ ঠিক চালিয়ে যেতেন।

তবে হারাধন হালদার তাঁর পূজা বা উপাসনার জন্যে কোন মন্দিরে বা উপাসনা কক্ষে যেতেন না। তাঁর প্রিয় ধ্যানের জায়গা ছিল একটি পাহাড়। সাঁওতাল পরগনার যে নির্জন অঞ্চলের একান্তে একটি বাংলোয় থাকতেন তিনি তার সামনে ফাঁকা প্রান্তরের একধারে ছিল একটি ছোট পাহাড়। হারাধন এই পাহাড়ের নামকরণ করেছিলেন উদাসী। এই উদাসীর পায়ের কাছে বসে থাকতেন তিনি ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত। পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য ধীরে ধীরে ওপরে উঠে পুবের আকাশ আলো করত। চতুর্দিক আলো হয়ে যাওয়ার পর হারাধন হালদার উঠে বাড়ির পথ ধরতেন। তারপর চা ও প্রাতরাশ খেয়ে তাঁর ল্যাবরেটরীতে ঢুকে গবেষণা করতেন বেলা একটা পর্যন্ত। প্রতিদিন তাঁর এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেউ কখনও দেখেনি।

অবশ্য দ্বিতীয় কেউ দেখার মধ্যে করালী কিংকর রুদ্র। হারাধন হালদার যে জনহীন প্রান্তরে তাঁর বাংলো বানিয়েছিলেন তার অল্প দূরেই থাকতেন করালীবাবু। একটা দোতলা বাড়ি কিনে সপরিবারে বাস করতেন তিনি। বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে গরমিল ছিল বিস্তর। করালীবাবুর বসস ষাটের ওপর। হারাধনের পঞ্চান্ন। হারাধন অকৃতদার, ভিখু নামে একটি বছর চল্লিশ বয়সের হিন্দুস্থানী ভৃত্য তাঁর আজীবন সঙ্গী। করালীবাবুর গড়ন মাঝারি, রং কালো। হারাধন হালদার লম্বায় পুরো ছ ফুট, গায়ের রং রীতিমতো ফর্সা। আর গরমিল ছিল স্বভাবে। হারাধন নিরলস গবেষণা করে যান, তা থেকে তাঁর আর্থিক লাভ কি হবে তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন না। যদিও দেশের ও বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর গবেষণার ফল চড়া দামে কিনতে আগ্রহী তবু হারাধনের এতে চরম আলস্য। করালীবাবু ঠিক এর বিপরীত। তিনি সব সময় বিদেশী জার্নাল ঘাঁটেন এবং ওদের প্রবন্ধের নকল করে তা তাঁর মৌলিক গবেষণা বলে এদেশের পত্র-পত্রিকায় বিক্রি করেন। শোনা যায় মলিকিউলের ওপর যে গবেষণা তিনি নজের বলে দাবী করে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. করেছেন সেটি আসলে তাঁর ছাত্র শুভব্রত সরকারের আবিষ্কার।

বলাবাহুল্য, হারাধন হালদারের মত নির্লোভ, গবেষণা পাগল এবং ঈশ্বরভক্ত মানুষ করালীর মত স্বার্থপর, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলবেন। করালী কিন্তু খুবই গায়ে পড়ে হারাধনের সঙ্গে ভাব জমাতে চান। তার পেছনেও থাকে তাঁর অসৎ উদ্দেশ্য। এক বছরের মধ্যে যে তিনবার তিনি এসে হারাধনের লাইব্রেরীতে বসেছেন, প্রত্যেকবারই তিনি চলে যাওয়ার পর ভিখু লক্ষ্য করেছে তার মনিবের আলমারীর একগোছা করে বই উধাও হয়েছে। তার ঢোলা ওভারকোটের মধ্যে দু-তিনটি বই কেন একটা গোটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে গেলেও কারও তা টের পাওয়ার উপায় নেই।

এক শরৎকালের সকালে প্রতিদিনের মত উদাসীর নিচে ধ্যানে বসেছিলেন হারাধন হালদার। এ সকালটি তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। আজকের ঘটনার সূত্র ধরেই তিনি এক চোখের দৃষ্টি হারান। যাক, সে কথায় পরে আসছি। ধ্যান শেষ হওয়ার মুখে হঠাৎ হারাধনের মনে হল পাহাড়ের চূড়োটা যেন একটু দুলে উঠল। হারাধন ভাবলেন ভূমিকম্প সুরু হতে যাচ্ছে না কি? কিন্তু না. একবার দুলে উঠেই স্থির হয়ে গেল পাহাড়ের চূড়ো আর ওপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ল সাদা খড়ির মত লম্বা গড়নের একটা অদ্ভুত পাথর। গড়াতে গড়াতে সেটা এসে পড়ল ঠিক যেখানে হারাধন হালদার পদ্মাসনে বসে আছেন তার সামনে। হারাধন অবাক হলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ওপর—পাহাড়ের ওপর কিম্বা আকাশের মাঝখান থেকে এক ললিত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'তোমার ভক্তিতে প্রীত হয়ে আমি এই উপহার দিলাম। এই যাদু-খড়ি দিয়ে লিখে তুমি যা চাইবে তাই পাবে।' হারাধন হালদারের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সামনে ঝুঁকে ঘড়িটা তুলে নিতে যাবেন তিনি তার আগেই পেছন থেকে একটি রোমশ হাত ছোঁ মেরে সেটি তুলে নিল। চকিতে মুখ ফিরিয়ে হারাধন দেখলেন করালীবাবু। কুটিল হাসি আর লোভার্ত চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি খড়িটার দিকে। চাপা গলায় বললেন, 'আমি শুনেছি, পাহাড়ের কথা। এমন একটি জিনিস আমি বহুদিন ধরে খুঁজছি।··· এটা আজ থেকে আমার।'

কিন্তু তিনি খড়ি দিয়ে লিখে সোনাদানা যা চান কিছুই সত্যি হয় না। কোন লেখাই ফুটতে চায় না খড়ির আঁচড়ে। তিন দিন তিন রাত এক নাগাড়ে চেষ্টা করে করালীর সন্দেহ হয় যে হয়ত হারাধন হালদার ছাড়া আর কেউ এ দিয়ে লিখলে কোন কাজ হবে না। এইরকম ভেবে উস্কো-খুস্কো অবস্থায় রাত্রে তিনি হারাধন হালদারের বাড়ি এসে বলেন, 'ঘড়িটা আমি তোমায় ফিরিয়ে দিতে পারি এক শর্তে। তুমি এ দিয়ে যা লিখে যা চাইবে তার দ্বিগুণ দিতে হবে আমায়। বল রাজী?'

হারাধন এ প্রস্তাবে রাজী হওয়ার পাত্র নন। কিন্তু তিনি দেখলেন তাহলে খড়িটা কোন কাজে লাগবে না। নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান বিষয়ে তিনি রাষ্ট্রসংঘের কার্যসূচী অনুযায়ী একটি বিশেষ গবেষণা করছিলেন। আশা ছিল, ধ্যানের মাধ্যমে বহু অজানা তথ্য জানতে পারবেন। তাই করালীকিংকরের প্রস্তাবে রাজী হলেন এই ভেবে যে তাঁর

পেছন থেকে একটা লোমশ হাত·····

লোভ চরিতার্থ হওয়ার পর হয়ত তিনি কাজে লাগাতে পারবেন এই দৈব-ঘড়ি। তাই করালীকিংকরের দিকে ফিরে হারাধন বললেন, 'আমি রাজী।'

হারাধনের হাতে খড়িটি দিয়ে করালীবাবু বললেন, 'চাও, তোমার জন্যে একটা গাড়ি আর আমার জন্যে দুটো।' হারাধন খড়ি দিয়ে তাঁর প্রার্থনা মাটিতে লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তাঁর বাড়ির সামনে একটি আর করালীবাবুর বাড়ির সামনে দুটি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বেজায় খুশি হয়ে করালী বলেন, 'বেশ, এবার চাও তোমার বাড়িটা দোতলা হয়ে যাক আর আমারটা...।'

তাই হল। করালীবাবু এখন চারতলা বাড়ি পেয়ে ফুর্তিতে আছেন। বাড়ি দোতলা হওয়াতে হারাধনবাবুর কিন্তু অস্বস্তির শেষ নেই। তিনি আগের একতলাতেই থাকেন। দোতলটা ফাঁকা পড়ে থাকে। গাড়ি নিয়ে হারাধনের দুর্ভাবনার শেষ হয়েছে। কলকাতায় ভাইপোকে চিঠি লিখেছিলেন। সে এসে নিয়ে গেছে গাড়ি।

কালো পাথরে গড়া পাহাড়ে অমন সাদা পাথরের টুকরো যে কোথা থেকে এল সে এক রহস্য। আবার সে পাথর দিয়ে স্পষ্ট লেখাও যায়। দৈব ঘটনা যে এখনও ঘটে এবং তা মানুষের যুক্তি ও বিচারকে অভিভূত করে ফেলে এ তারই প্রমাণ। ওই খড়ির দৌলতে এখন করালী-বাবুর গাড়ি, বাড়ি, ফলের বাগান, আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ল্যাবরেটরী, কিছুরই অভাব নেই। বলা বাহুল্য হারাধনও এই সবের অর্দ্ধেক পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর অস্বস্তির শেষ ছিল না। তিনি বরাবরই এইসব পার্থিব ভোগ বিলাস এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন। ইতিমধ্যে নক্ষত্র-পুঞ্জের অবস্থান নিয়ে প্রাচীন একটি ব্রাহ্ম লিপির সাহায্যে তাঁর প্রয়োজনীয় সব খবর তিনি জানতে পেরে গিয়েছেন। শ্যামল, তাঁর ভাইপোই কলকাতা থেকে এই পুঁথি যোগাড় করে এনে দিয়েছিল। এখন পূর্ণ উদ্যমে গবেষণায় লাগবার আগে তিনি চাইছিলেন এই খড়ি থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং করালীকে সাজা দিতে তাঁর লোভের জন্যে। একদিন তিতি বিরক্ত হয়ে তিনি করালী কিংকরকে বললেন, এভাবে আমার আর ভাল লাগছে না। আপনি আপনার শর্ত ফিরিয়ে নিন। করালী হেসে বললেন, 'তা-ও কি হয়! আমার এখনও অনেক জিনিস বাকি।' হারাধন তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, 'বেশ, তাহলে আমি এখন এমন একটা জিনিস চাইব যার দ্বিগুণ পাবেন আপনি আর যার জন্যে হয়ত অনুশোচনা করতে হবে আপনাকে।' তাই আপনি ভেবে দেখুন।

মাথা ঝাঁকিয়ে করালী বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই। চাও তোমার যা খুশি। আর আমি তো তোমার ডবল পাবোই। তাতে লাভ বিনা লোকসান নেই।'

হারাধন বললেন, 'বেশ, আপনি যখন রাজী তখন আমি চাইছি আমার চাওয়ার জিনিস।' খড়ি দিয়ে মেজের ওপর হারাধন এই কথা কটি লিখলেন, 'আমার এক চোখ অন্ধ হয়ে যাক। এক চোখের দৃষ্টি হারিয়ে কাজ করতে হারাধনের এখন বেশ অসুবিধে হয়, তবু তিনি কষ্ট করে তা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যাদু খড়ির উৎপাত থেকে তো মুক্তি পেয়েছেন আর দু চোখ অন্ধ করালী কিংকর যেমন বিজ্ঞান সাধনা করতে অক্ষম তেমনি তাঁর কাছে তাঁর বিপুল সম্পত্তিরও কোন মূল্য নেই এখন।

যাদু-খড়ির কাছ থেকে শেষ দানটি নেওয়ার পরদিন সূর্য ওঠার আগে উদাসীর কাছে বেড়াতে গিয়ে যাদু খড়িটি সজোরে পাহাড়ের চূড়োর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হারাধন হালদার বললেন, 'দূর হোক, প্রলোভন।'

খড়িটি সেই পাহাড়ের গর্ভে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে। সেদিন সন্ধ্যায় আকাশে যখন শুকতারা দেখা দিল তখন তার দিকে তাকিয়ে হারাধন হালদারের মনে হল সে যেন অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী জ্বল্ জ্বল্ করছে, আর তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে।

সেই রাতেই নক্ষত্রপুঞ্জের ওপর তাঁর দীর্ঘ গবেষণা সুসম্পন্ন করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেলেন হারাধন হালদার।

হারাধন হালদার কি সত্যিই এরকম যাদুঘড়ি পেয়েছিলেন? না সবটাই স্বপ্ন?

16, কালীবাড়ীলেন, চাকুরিয়া, কলিকাতা-31।

ছড়া

বিজ্ঞানের দাপটে

তপোময় ঘোষ

রাস্তা ঘাটে সাধু
দেখায় অনেক যাদু
বিজ্ঞানেরই ছাত্র দেখলে
মুখটা কাঁদু কাঁদু।

গঞ্জে গাঁয়ে লোকে
অবিজ্ঞানেই ঝোঁকে
জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক যেন
সেখানেতেও ঢোকে ॥

বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত এক বছরে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত শব্দকূট রচনায় সফল প্রতিযোগী

প্রথম ঃ সুজনবন্ধু সামন্ত। প্রযত্নে সুনীলকুমার সামন্ত, গ্রাম—কিসমত জগন্নাথ চক, পোঃ মাগুরী জগন্নাথ চক, পাঁশকুড়া আর এস, মেদিনীপুর।

দ্বিতীয় ঃ সুকৃত ঘোষ। পোঃ সিউড়ি, বীরভূম।

তৃতীয় ঃ কণকাকিরণ ঘোষ। পোঃ কেশিগ্রাম, বর্ধমান

প্রবন্ধ ও গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর গল্প প্রতিযোগিতায়

প্রথম ঃ দিব্যেন্দু ভৌমিক, ফতেপুর শ্রীনাথ ইনসটিটিশন (XI) পোঃ ফতেপুর, 24 পরগনা।

দ্বিতীয় ঃ কমলকান্তি সেন প্রযত্নে কৃষ্ণপদ সেন, গ্রাম যশড়া, নতুন গ্রাম, পোঃ চাকদহ, নদীয়া 741222 (চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমী) **তৃতীয় ঃ** হিমাংশু পাল (XII) (চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমী) পোঃ চাকদহ নদীয়া।

বিচারকমণ্ডলী ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র। সমরজিৎ কর। জয়ন্ত দত্ত।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়

প্রথম ঃ তাপসকুমার মুখোপাধ্যায় (XII) গুড়া পাশলা এস কে শিক্ষা নিকেতন, পোঃ গুড়া, মুর্শিদাবাদ।

দ্বিতীয় ঃ মলি রায় (XI) প্রযত্নে সন্তোষকুমার রায়, নুঙ্গী, ধর্মতলা, পোঃ বাটানগর, 24 পরগনা 743313

তৃতীয় ঃ অরুণাভ সোম (XI), পানিপারুল মুক্তেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ পানিপারুল, জেলা মেদিনীপুর।

বিচারকমণ্ডলী ঃ অমরনাথ রায়, সমরজিৎ কর ও জয়ন্ত দত্ত।

নবম ও দশম শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়

প্রথম ঃ জয়ন্ত ব্যানার্জী (X), উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, 4E ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী লেন, পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী। **দ্বিতীয় ঃ** অভিজিৎ সরকার (X), প্রযত্নে অমলেন্দু সরকার, সুভাষপল্লী খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

তৃতীয় ঃ জাহানারা রহমান (X), প্রযত্নে মনসুর রহমান, রামপুরহাট গালর্স হাই স্কুল। অ্যালবার্ট ভিলা, নিশ্চিন্তপুর, পোঃ রামপুরহাট, বীরভূম।

বিচারকমণ্ডলী ঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী, সমরজিৎ কর ও অমরনাথ রায়।

নবম ও দশম শ্রেণীর গল্প প্রতিযোগিতায়

প্রথম ঃ দেবেশ দাশ (X), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রণব বিদ্যাপীঠ, পোঃ ডায়মণ্ড হারবার, 24 পরগনা—743331।

দ্বিতীয় ঃ সুজাতা চট্টোপাধ্যায় (IX), পুরুলিয়া মহেন্দ্র বিদ্যাপীঠ। পোঃ নারা পুরুলিয়া, জেলা ঃ পুরুলিয়া।

তৃতীয় ঃ সুপ্রিয় বসু (X), প্রযত্নে বিমান বসু, 41 এস এন বোস রোড, দুর্গাপুর বর্ধমান—713205।

বিচারকমণ্ডলী ঃ অদ্রীশ বর্ধন, সিদ্ধার্থ ঘোষ, জয়ন্ত দত্ত।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়

প্রথম ঃ ছন্দোময় মণ্ডল (VIII), কল্যানী ইউনিভার্সিটি এক্সপেরিমেণ্টাল বিদ্যালয়। প্রযত্নে বারিদ মণ্ডল। বি/15/77 লেক প্লেস কল্যানী নদীয়া, 741225

দ্বিতীয় ঃ মৌসুমী দত্ত (VII), ডি. ভি গার্লস হাই স্কুল, পোঃ চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান।

তৃতীয় ঃ দয়াময় মাজী (VIII) চন্দ্রা কল্যাণ সঙ্ঘ হরিজন বিদ্যালয়, পোঃ চন্দ্রা, জেলা বাঁকুড়া।

বিচারক মণ্ডলী ঃ অমরনাথ রায়, সমরজিৎ কর, জয়ন্ত দত্ত।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর গল্প প্রতিযোগিতায়

প্রথম ঃ অরিন্দম দাস মাজী (VIII), রানিয়া কুলটুকারি উচ্চ বিদ্যালয়। পোঃ রানিয়া গোবিন্দপুর দক্ষিণ 24 পরগনা। 743318

দ্বিতীয় ঃ অংশুমান কর। বেলিয়াতোড় উচ্চ বিদ্যালয়। পোঃ বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

তৃতীয় ঃ ভুবনেশ্বর মণ্ডল, প্রযত্নে ধরাধর মণ্ডল। পোঃ চণ্ডীদাস নানুর, বীরভূম। 731301

বিচারকমণ্ডলী ঃ শিশিরকুমার মজুমদার, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরজিৎ কর।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়

প্রথম ঃ সুরজিৎ দে প্রযত্নে করুণাময় দাস, গ্রাম—উটপাথর, পোঃ নিমপাড়া, জেলা—মেদিনীপুর।

দ্বিতীয় ঃ মল্লিকা ধর, হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয় পোঃ নবগ্রাম (কোন্নগর) হুগলী।

বিচারকমণ্ডলী ঃ অজয় হোম, সমরজিৎ কর ও জয়ন্ত দত্ত।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর গল্প প্রতিযোগিতায় কোন গল্প পাওয়া যায়নি।

আই কিউ টেস্ট, সিনিয়র জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ও ফটো ক্যুইজ এর সফল প্রতিযোগিদের মধ্যে যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারোনি এবং উপরে ঘোষিত সফল প্রতিযোগিদের অনুরোধ করা হচ্ছে অবিলম্বে তাদের পুরস্কার ও মানপত্র দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য। নির্দিষ্ট তারিখের পর তাদের মানপত্রগুলি **সাধারণ ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।**

দশ ঃ নরবানরদের সম্মেলন

একটা টর্চ আর খানকয়েক বই জিরা আমাকে দিয়েছে সবার চোখ এড়িয়ে। খড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছি। রাত্রে টর্চের আলোয় বই পড়ি। সোরোর গ্রহের নরবানরদের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর জেনেছি এই সব বই পড়ে।

পৃথিবীতে বহু দেশে বহু জাত। সোরের গ্রহে বাঁদরদের জাত একটাই। একটা মান্ত্রপরিষদ শাসন করছে গোটা গ্রহটাকে। শীর্ষস্থানে আছে একজন গরিলা, একজন ওরাংওটাং আর একজন শিম্পাঞ্জী। মন্ত্রীপরিষদকে সাহায্য করে একটা পার্লামেণ্ট। তিনটে পর্ষদ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই পার্লামেণ্ট। গরিলাদের পর্ষদ, ওরাংওটাংদের পর্ষদ আর শিম্পাঞ্জীদের পর্ষদ। প্রত্যেক পর্ষদ নিজেদের সদস্যদের স্বার্থ দেখে।

মাত্র এই তিনটে উপজাতিতেই ভাগ করছে বাঁদর জাতটাকে। অধিকার প্রত্যেকের একই। যে কোনো পদে আসীন হতেও পারে। তা সত্ত্বেও, দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রত্যেক উপজাতি নিজেদের বিশেষ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

সুদূর অতীতে গায়ের জোরে রাজত্ব চালিয়েছিল গরিলারা। এখনও তারা সব চাইতে শক্তিশালী সম্প্রদায়। হুকুম চালাতে ওস্তাদ। খবরদারির কাজে পোক্ত। পাঁচ জনের ভিড়ে তাদের দেখা যায় না, গণ-আন্দোলনেও অংশ নেয় না। কিন্তু বড় বড় সংস্থা পরিচালনা করে খুবই উঁচু মহল থেকে। সংগঠন করা একটা মস্ত আর্ট। এই আর্টে অন্য দুই উপজাতির বাঁদরদের এরা ছাড়িয়ে গেছে এবং খাটিয়ে নিতে পারে সবাইকেই। চিত্তাকর্ষক কোনো আবিষ্কার যদি করে বসে কোনো টেকনিসিয়ান—যেমন, আলো ছড়ানো নল, অথবা সহজদাহ্য জ্বালানি - গরিলারাই আবিষ্কারটাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটে যাবে। প্রতিভাবান না হলেও গরিলারা অনেক বেশি খলিফা ওরাংওটাংদের চেয়ে। ওরাংওটাংরা অহঙ্কারে মটমট করছে। এই অহঙ্কারে সুড়সুড়ি দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে নিতে জানে গরিলারা। আমি যে সংস্থায় খাঁচার মধ্যে বন্দী, জেয়াস সেখানকার সায়েণ্টিফিক ডিরেক্টর। কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে আছে একজন গরিলা। তাকে চোখে দেখা যায় না বটে, কিন্তু প্রতাপটা টের পাওয়া যায়। একদিনই সে এসেছিল আমাদের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আমি। জেয়াস নিজেও যেন নিভে গেছিল তার প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে। দেখেই বুঝেছিলাম আমাদের সামনে যতই তড়পাকনা কেন, গরিলা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পদলেহনে জেয়াস বিলক্ষণ পটু।

উঁচু পদ পায় নি যে সব গরিলা, তাদেরকে এমন সব কাজে লাগানো হয় যেখানে গায়ের জোর দরকার। আইন শৃংখলা বজায় রাখতে এদের জুড়ি নেই। এছাড়াও, ভাল শিকারী হিসেবে গরিলাদের নামডাক দারুণ। শিকার করার ব্যাপারটা ওদের ওপরই ছাড়া আছে। পাকড়াও করে বুনো পশু, বিশেষ করে মানুষ। আগেই বলেছি, বাঁদররা এক্সপেরিমেণ্ট করে মানুষদের ওপর। অনেক মানুষ দরকার সেইজন্যে। এক্সপেরিমেণ্টগুলোর গুরুত্ব

আবিষ্কার করার পর থেকে বেশ দমে পড়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে পরে আসব। শুধু একটা কথা বলে রাখি, জ্যান্ত মানুষ ধরতে পারলে চড়া দাম পাওয়া যায় এখানে।

গরিলাদের পরেই গুরুত্বের দিক দিয়ে নাম করতে হয় ওরাংওটাং আর শিম্পাঞ্জীদের। জিরা অবশ্য এক কথায় ওরাংওটাংদের এলেম বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে। মুখস্থ বিদ্যা ওগরাতে এরা বড় পটু। নতুন কিছু আবিষ্কারের ক্ষমতা নেই, কিন্তু গম্ভীরি চালে চলাফেরার মধ্যে দেমাক যেন ছিটকে পড়ছে। যখন তখন রাজনীতি, শিল্পকলা আর সাহিত্যেও নাক গলায়। কিন্তু নতুন চমক দেখাতে পারে না। যেহেতু স্মৃতিশক্তি ভাল, তাই বইপড়া বিদ্যেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকাশ করে অন্য বই লেখে—সবই মূল বইয়ের পুনরাবৃত্তি।

মূল বইয়ের লেখক কিন্তু শিম্পাঞ্জীরা. উদ্ভাবনী শক্তি এদের মধ্যেই আছে। ওরাংওটাংদের এরা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, জিরা আর কর্নেলিয়াসের কথাতেই তা প্রকাশ পেয়েছে।

গরিলারাও ওরাংওটাংদের সুনজরে দেখে না। আড়ালে হাসাহাসি করে। কিন্তু ভালপদে বসিয়ে নিজেরা মাথার ওপর থেকে কাজটা ঠিক করিয়ে নেয়। কাজ করার ক্ষমতা ফুরিয়ে গেলেই দূর করে দেয়।

সোরোর গ্রহের একমাত্র প্রতিভাবান প্রাণী কিন্তু শিম্পাঞ্জীরাই প্রকৃতই গবেষক। বিভিন্ন বিষয়ে ভাবনা জাগানো বই লিখতে পোক্ত। যতকিছু আবিষ্কার ঘটেছে সোরোর গ্রহে, সবকটার মূলে আছে শিম্পাঞ্জীরা।

ওরাংওটাংদের জ্ঞানের দম্ভিকতার জন্যে অনেক ভুল জিনিস শেখানো হয়ে এসেছে সোরোর গ্রহের বাচ্চাদের। কয়েক হাজার বছর আগে হ্যারিসটাস নামে এক নরবানর একখানা বই লিখেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে নাকি সোরোর গ্রহ। যেহেতু ছাপার অক্ষরে লেখা অতি প্রাচীন বই, ওরাংওটাংরা ভুল শিক্ষাটাই দিয়ে এসেছে স্কুল কলেজে এতদিন ধরে। সম্প্রতি কিছু শিম্পাঞ্জী উঠে পড়ে লেগেছে—ভুল ধারণাটা ভাঙতে চলেছে।

গরিলারাও বই লেখে বেশির ভাগই শিকার, সংগঠন আর রাজনীতির ওপর। খানকয়েক আমি পড়েছি।

সোরোর গ্রহ পৃথিবী গ্রহের চাইতে একটু বেশি বুড়ো ঠিকই, কিন্তু এগ্রহে যুদ্ধ নেই, একতা আছে। সামরিক বাহিনী পুষে খরচ করে না—পুলিশ দিয়েই দিব্যি কাজ চলে।

এদের ইলেকট্রিসিটি আছে, কল-কারখানা আছে, মোটরগাড়ি আছে, এরোপ্লেন আছে। তবে মহাশূন্য জয় করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে পাঠিয়েই দৌড় ফুরিয়েছে। জ্ঞানের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে এরা মানুষের চেয়ে। তবে শিম্পাঞ্জীরা যেভাবে গবেষণা চালাচ্ছে, জ্ঞানবিজ্ঞানে পৃথিবীর মানুষের নাগাল ধরে ফেলবে দূর ভবিষ্যতে।

গবেষণাটা মূলতঃ কিন্তু জীববিজ্ঞান সম্পর্কে। এত মানুষ দরকার হয় সেই কারণেই। মানুষের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমছে সোরোর গ্রহে, বাড়ছে বাঁদরদের সংখ্যা। উদ্বেগদেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে।

বাঁদরদের আদি উৎস অথবা তাদের ক্রমবিবর্তন কিন্তু আজও একটা রহস্য। আমি যেমন এদের ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারিনি, তেমনি অনেক শিম্পাঞ্জী বৈজ্ঞানিকও মনের মধ্যে সংশয় রেখে দিয়েছে। বাঁদর জাতটা এল কোথা থেকে, কিভাবে এত উন্নত হল—এ সমস্যা নিয়ে নতুন করে যারা ভাবছে, তাদের মধ্যে রয়েছে কর্নেলিয়াস।

কর্নেলিয়াসের মগজ খুবই ধারাল। সমাধনটা একদিন বার করবেই করবে।

আমাকে প্রায় বেড়াতে নিয়ে যেত জিরা। কখনও কর্নেলিয়াসের সঙ্গে দেখা হত। তিনজনে মিলে ঠিক করতাম কিভাবে বক্তৃতা দেব আসন্ন সম্মেলনে। দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই ঘাবড়ে যাচ্ছি। জিরা অবশ্য অভয় দিয়ে চলেছে। কর্নেলিয়াসও চায় আমার মুক্তি। তাহলে আমার সঙ্গে মিলেমিশে গবেষণা চালাবে।

একদিন কর্নেলিয়াস আসেনি। জিরা আমাকে নিয়ে গেল পার্কের লাগোয়া চিড়িয়াখানায়। ইচ্ছে ছিল থিয়েটার অথবা মিউজিয়ামে যাওয়ার। কিন্তু জিরা রাজি হল না। ওসব আমোদ প্রমোদে ঢোকার অধিকার অর্জন করিনি এখনও। বাঁদরদের কলাবিদ্যা সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি, সবই বই পড়ে। পেন্টিংয়ের ছবি দেখেছি অনেক। নিসর্গ দৃশ্য, প্রতিষ্ঠিত নরবানরদের প্রতিকৃতি, ডানাওলা ছোট্ট বাঁদর উড়ছে কিউপিডের মত (বহু মেয়ে নরবানরীকে ঘিরে), যুদ্ধ যখন হত তখনকার মিলিটারি পেন্টিং—ঝলমলে পোশাক পরা রক্তহিমকরা গরিলাদের ছবি। টর্চের আলোয় খাঁচার মধ্যে বসেই দেখেছি এত ব্যাপার। ফুটবল খেলাতেও একবার নিয়ে গেছিল জিরা। আর একবার গরিলাদের বক্সিং ম্যাচে—লোমহর্ষক দৃশ্য।

চিড়িয়াখানায় গেছিলাম তাই মহা আনন্দে। পশুপাখির সঙ্গে বেশ মিলে রয়েছে পৃথিবীর জন্তু জানেয়ারেরা। তিন কুঁজওয়ালা একটা উট দেখেছিলাম আর দেখেছিলাম বলগাহরিণের মত শিংওয়ালা একটা বুনো শুওর।

অবাক হয়েছিলাম মানুষদের খাঁচার দিকে গিয়ে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে গোটা পঞ্চাশ মানুষ হট্টগোল করছে খাঁচার মধ্যে। বাচ্চা বাঁদররা খাঁচার বাইরে থেকে খাবার ছুঁড়ে দিচ্ছে, তাই নিয়ে চলছে লোফালুফি আর কাড়াকাড়ি।

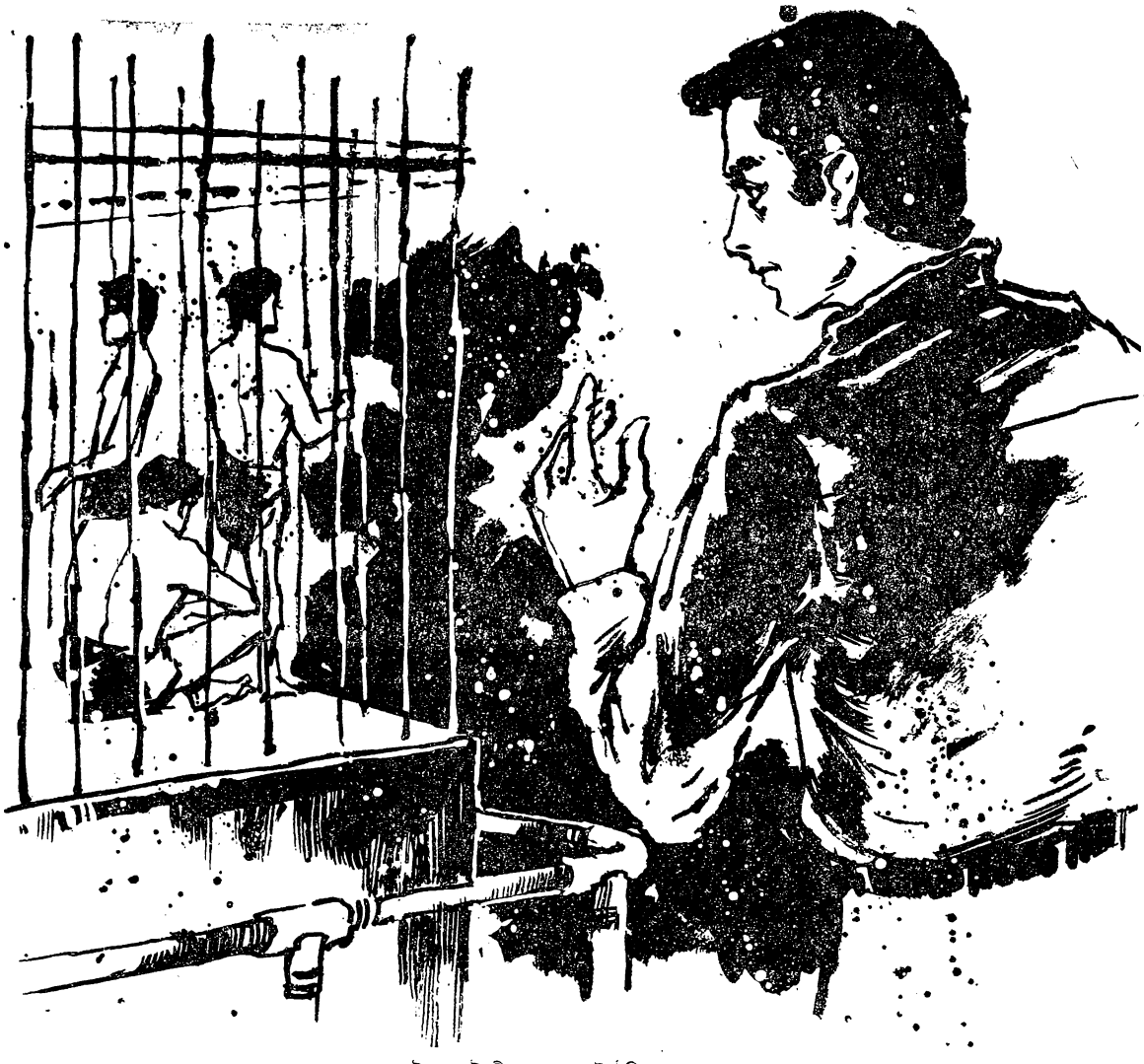

একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠেছিলাম·····

জনাকয়েক মানুষ হুল্লোড়ের মধ্যে না গিয়ে বসে রয়েছে গরাদ ঘেঁষে। হাত পেতে নিচ্ছে খাবার। মুখে পুরে দিয়ে আবার হাত পাতছে।

এদের মধ্যেই দেখলাম প্রফেসর অ্যাণ্টেলেকে বসে থাকতে। অ্যাণ্টেলে! আমাদের মহাকাশ অভিযানের দলপতি! পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক! হাত পেতে খাবার নিচ্ছেন, খাচ্ছেন আবার হাত পাচ্ছেন!

অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিলাম। ছুটে যেতে গেছিলাম সেদিকে—হাত টেনে ধরল জিরা। জানতে চাইল কি ব্যাপার। বললাম সব। শুনে বাধা দিল জিরা। বললে—"এখন ওঁর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে তোমার আর ওঁর দুজনেরই বিপদ। সম্মেলনটা আগে হোক—তারপর।"

ঠিকই বলেছে জিরা। ফিরে এলাম ইন্সটিটিউটে নিজের খাঁচায় খাবার এনে দিল গরিলারা। কিন্তু খেতে পারলাম না সে রাতে।

সম্মেলনের আগের সপ্তাহে বেশ কয়েকবার আমাকে নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে গেল জেয়াস। সবই হাস্যকর ব্যাপার। সেক্রেটারীকে দিয়ে লেখাল পরীক্ষার ফলাফল একগাদা নোটবইয়ে। ও আমাকে যতটুকু বুদ্ধিমান ভাবে, ঠিক ততটুকুই বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে গেলাম ইচ্ছে করে—তার বেশি নয়।

অবশেষে এল বহু প্রতীক্ষিত সম্মেলনের দিনটি। কিন্তু প্রথম দুটো দিন গেল শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায়। তৃতীয় দিনে ডাক পড়ল আমার। সম্মেলনে যা কিছু

ঘটছে, সব খবরই জিরা জানিয়ে গেল আমাকে। জেয়াস নাকি আমার সম্পর্কে দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশ করেছে। আমার সহজাত বুদ্ধি নাকি ধারাল, কিন্তু চিন্তাশক্তি একেবারেই নেই। কর্নেলিয়াস বিতর্ক শুরু করে দিতেই টক্কর লেগেছিল জেয়াসের সঙ্গে। বৈজ্ঞানিকরাও দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছিল। আসল ব্যাপারটা কারুরই মাথায় আসেনি। কর্নেলিয়াস আর জিরা ছাড়া জানতেও পারেনি। তা সত্ত্বেও জেয়াসের প্রতিবেদন সাড়া ফেলেছে বৈজ্ঞানিক মহলে। অদ্ভুত একটা মানুষ আবিষ্কৃত হয়েছে, এই গুজবও ছড়িয়ে পড়েছে গোটা শহরে।

খাঁচা থেকে আমাকে বার করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে কানে কানে তাই বলেছিল জিরা—"ভীষণ ভিড় হবে, খেয়াল রেখো। খবরের কাগজ থেকে প্রত্যেকে আসবে। আশ্চর্য কিছু একটা দেখা যাবে, এই উৎকণ্ঠায় ছটফট করছে প্রত্যেকেই। সুবর্ণ সুযোগ। মনে সাহস আনো।"

সাহস আনব কী, ভয়ের চোটে চুপসে গেছি গত দুদিনের তর্কযুদ্ধের বিবরণ শুনে। সারারাত ধরে মহড়া দিয়েছি বক্তৃতার। প্রত্যেকটা শব্দ মুখস্থ করে ফেলেছি। কিন্তু আদৌ কথা বলতে দেওয়া হবে কিনা, এই দুশ্চিন্তায় নার্ভাস হয়ে গেছি একেবারেই।

খাঁচা-গাড়িতে চাপিয়ে গরিলারা নিয়ে গেল আমাকে আরও কয়েকজন মানুষের সঙ্গে। প্রত্যেকের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমার মতই—জ্ঞানীগুণীদের সামনে হাজির করার মত। গাড়ি এসে দাঁড়াল বিশাল একটা ইমারতের সামনে। সম্মেলন যে হলঘরে চলছে, তার লাগোয়া, একটা খাঁচাঘরে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। বৈজ্ঞানিকদের মর্জিমত এক-একজনকে নম্বর হেঁকে ডেকে নিয়ে গেল কালো ইউনিফর্ম পরা গেরিলারা। গলায় বকলস পরিয়ে, চেন ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া দেখে হাত-পা হিম হয়ে গেল আমার। বুক ধড়াশ ধড়াশ করে উঠল প্রতিটা মানুষকে সম্মেলন কক্ষে ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাততালি আর হট্টগোলের শব্দে।

খাঁচা থেকে একবার বের করে নিয়ে নরবানরদের সামনে হাজির করার পর আর কোনো মানুষকেই ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল না খাঁচায়—সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ইন্সটিটিউটে। কাজেই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমি একা রয়েছি খাঁচায়, দাঁড়িয়ে রক্ষীরা। আমি যেন এই মহতী অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ—তাই রেখে দেওয়া হয়েছে শেষ মুহূর্তের জন্যে। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে হবে—ভাবখানা এইরকম। কিন্তু 'ওস্তাদের' অবস্থা যে কাহিল, তা কেউ বুঝছে না। ভয়ের চোটে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে যখন, ঠিক তখনই কৃষ্ণকায় গরিলা এগিয়ে এসে ডাকছিল আমার নম্বর ধরে।

উঠে দাঁড়ালাম তৎক্ষণাৎ। গরিলা রক্ষীকে হকচকিয়ে দিয়ে ছোঁ মেরে হাত থেকে কেড়ে নিলাম গলার বকলসটা—নিজেই এঁটে নিলাম নিজের গলায়। তারপর দুপাশে দুই বডিগার্ডকে নিয়ে অতিকষ্টে চরণযুগলকে স্থির রেখে প্রবেশ করলাম সম্মেলন কক্ষে। চৌকাঠ পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে থ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—এত কষ্টে সঞ্চয় করা সাহস উবে গেল চক্ষের নিমেষে!

সোরোর গ্রহে আসবার পর থেকে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখেছি। নরবানরদের দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছিল বলেই ভেবেছিলাম সম্মেলনে আগত এই কিম্ভূত জীবগুলোকে দেখে চমকে উঠব না মোটেই। কিন্তু এমন বিরাটত্ব আর এত বিপুলসংখ্যক নরবানরের সমাবেশ কল্পনাও করতে পারিনি। অসাধারণ দৃশ্য নিঃসন্দেহে। দেখে মাথা ঘুরতে লাগল। দু-পা অচল হয়ে গেল। দিবাস্বপ্ন দেখছি কিনা সন্দেহ হল।

দান্তে বর্ণিত শঙ্কু-আকৃতি নরক গুলজারের দৃশ্য সেই মুহূর্তে মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল কেন, তাবলতে পারব না। যা দেখলাম, তা একটা দানবাকৃতি রঙ্গস্থল ছাড়া কিছুই নয়। বৃত্তাকার অট্টালিকা—চারিদিকে সিঁড়ির মত আসন থাকে থাকে উঠে গেছে ওপর দিকে। এককথায় যাকে বলা যায় অ্যাম্ফিথিয়েটার। প্রতিটি সারি গিজ গিজ করছে নরবানরে। হাজার কয়েক তো বটেই। এর আগে কখনও এত নরবানরকে একজায়গায় এরকম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বসে থাকতে দেখিনি। আমার পার্থিব কল্পনাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য। এককথায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

হোঁচট খেয়েছিলাম চৌকাঠেই। ধড়ফড় করে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলাম ভিড়ের মধ্যে আশার আলোর সন্ধানে। সার্কাসের এরেনার মত গোলাকার একটা চত্বরের মাঝে নির্মিত মঞ্চের দিকে আমাকে ঠেলে দিয়েছিল রক্ষীরা। অনেকটা সামলে নিয়েছিলাম নিজেকে। ধীর-স্থিরভাবে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলাম চারপাশে। থাকে থাকে সাজানো আসন-সারি উঠে গেছে প্রায় সিলিং পর্যন্ত। এত উঁচুতে যে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাতে হয়। প্রতিটি আসনে বসে একজন করে নরবানর। আমার একদম কাছের আসনগুলোয় বসে রয়েছে সংসদ সদস্যরা। বৈজ্ঞানিক প্রত্যেকেই। জনাকয়েক গরিলা আর শিম্পাঞ্জী আছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় তারা নগণ্য। কর্নেলিয়াসকে খুঁজলাম এদের মধ্যেই—দেখতে পেলাম না।

কর্তাব্যক্তিদের পেছনের কয়েকটা সারিতে বসে জুনিয়র বৈজ্ঞানিকরা। বড় বৈজ্ঞানিকদের সাগরেদ এরা। এইখানেই রয়েছে ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিকদের বসবার জায়গা। তারও পেছনে কাতারে বসে নরবানররা। রীতিমত উত্তেজিত অবস্থায়। হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা জানাল আমাকে দেখতে পেয়েই।

[চলবে]

গিরগিটি

ধীরেন দত্ত

আমাদের প্রোগ্রাম ছিল টাইগার রিজার্ভের গভীর জঙ্গলের দিকে যাওয়া।

বাঘনার কাছে এসে ভাবলাম একবার রেনুজ অফিসার রামপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই। ভদ্রলোক আপ্যায়ন করে বললেন, বসুন বসুন, একটু চ-টা খেয়ে যান। চা এবং তার সাথে টা তৈরি হতে দেরী হচ্ছিল। আমি বাংলোর বারান্দায় বসে আছি, হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের ঘরের খড়ের চালের ওপর দিয়ে কি যেন হাঁটছে, মনে হল একটা খড়ের দলা গুড়ি গুড়ি হেটে এগিয়ে যাচ্ছে, ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটা লাফ দিয়ে পাশের পাকুড়ের ডাল ধরল, সাথে সাথে দেখি সবুজ পাতার রঙের সাথে মিশে সবুজ রঙের গিরগিটিটা সড়সড়িয়ে ডাল বেয়ে বেয়ে উঠে চলেছে। একটু পরেই দেখি গাছের

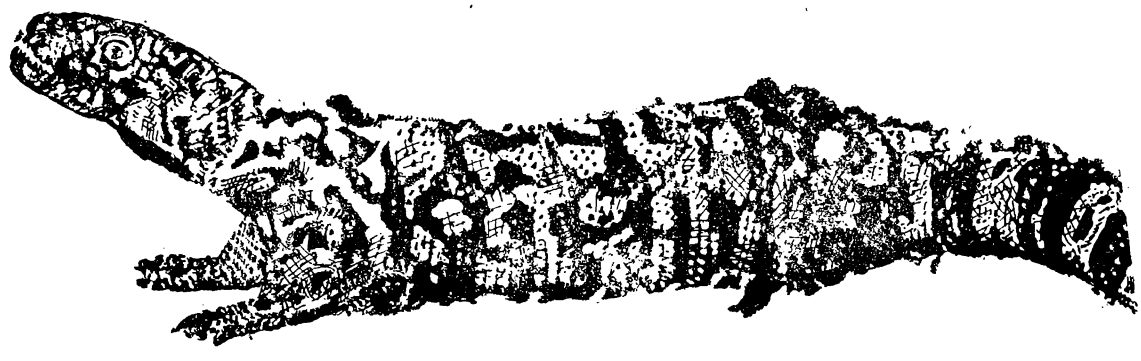

গুড়ি বেয়ে নামছে, তখন সে ধরেছে মেটে রংয়ের সাজ আর গাছের গুড়ির সাথে মিশে আছে, তফাৎ বুঝবার উপায় নেই। গভীর বনের মধ্যে এই প্রাণীটাকে যখন মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখেছি তখন ওর গায়ের রং মাটির রংয়ের সাথে একাকার। এই রকম একটা প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে নানা রং বদলায়, সে হচ্ছে গিরগিটি। ইংরাজি নাম Gecko বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় Phelsuma Blyth, সুন্দরবনের সমস্ত অংশে এই প্রাণীটা প্রচুর সংখ্যায় আছে, ছোট ছোট পোকামাকড় ধরে ধরে খায়। ছোট বাবুই পাখির বাচ্চা ধরে সাপটাতে দেখেছি। একবার যখন আমরা সুন্দরবনের ডাঁস-মৌমাছি (Apis Dorsate) নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলাম তখন একটা মৌচাকের কাছে এই রকম একটা গিরগিটিকে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে দেখি, সে কপাকপ মৌমাছি ধরছে আর গিলছে। কোনো কোনোটার পিঠের দিকে সোনালী আঁকিবুকি বা সোনালী টান আছে, দুটো মর্দা যখন ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকে তখন কড়্ কড়্ করে ডাক ছাড়ে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের শেষে গাছের কোটরে দশ-বারোটা ডিম পাড়ে মাদিরা। 'যা কোনো রকম 'তা' না দিয়েই তিরিশ দিনে ডিম থেকে ক্ষুদ্রাকার টিকটিকির বাচ্চার মত বাচ্চা বের হয়। খাদ্যের সন্ধানে গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে ঘুরে ফেরে স্বচ্ছন্দে, আবার বাজপাখি ও চিলের খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারায়, এ ছাড়া রাতের বেলায় পেঁচারা এদের অধিক সংখ্যায় সংহার করে। পৃথিবীর অনেক দেশে যেখানে মানগ্রোভের জঙ্গল আছে, সেই রকম অনেক দেশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনে এদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল কেউটে গোখরো আর খরিশ।

একরাতে আমি ওর কাজকর্মের দিকে লক্ষ করছি হঠাৎ দেখি লম্বা মত কি যেন দাগ কাটা কাটা খবরের কাগজের স্তূপের তলা থেকে দেখা যাচ্ছে। সড়সড়িয়ে নেমে এল গিরগিটিটা এবং সাহস করে লম্বা লেজের আগায় কামড় বসিয়ে গিলে নিল। আসলে ওটা ছিল একটা ঘর-চিতিসাপ। চিতিটা বেরিয়ে এল কাগজের স্তূপের ভেতর থেকে। গিরগিটিটা ততক্ষণে ওর লেজের অনেকখানি গিলে নিয়েছে। ঝটাপটি করতে করতে ওরা দুজনে মেঝেয় পড়ল। সাপটার লেজ থেকে অনেকখানি যখন গিরগিটিটা গিলে নিয়েছে তখন সাপটা আত্মরক্ষারজন্য উল্টে গিরগিটির ঘাড়ের কাছে কামড় বসিয়েছে। দুজনে জড়াজড়ি করতে করতে গিয়ে পড়ল চালের বস্তার ওদিকে। আমি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি দুই দানব মরে পড়ে আছে জড়াজড়ি করে। চিতি সাপটার আধখানার মত চালান হয়ে গেছে গিরগিটিটার পেটের মধ্যে।

মাকালতলা, পোঃ-বালী দুর্গাপুর, হাওড়া।

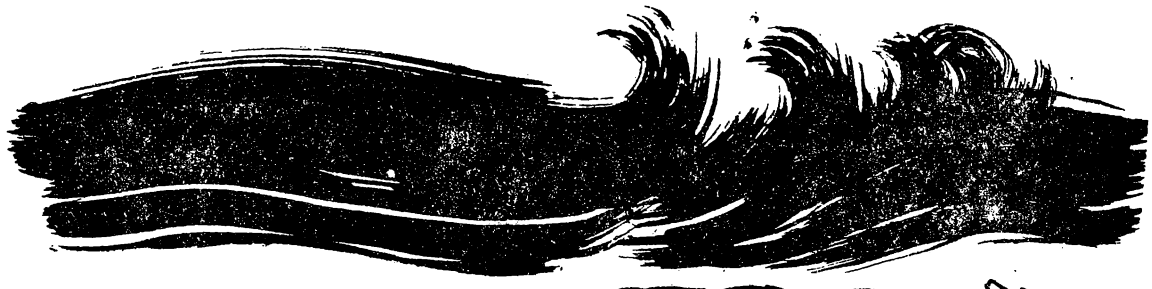

সমুদ্র সম্পদ

জয়দেব সেঠ

অজানাকে জানতে, মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করতে আজকের বিজ্ঞান সমুদ্রকে জানার এক অদম্য আগ্রহ অনুভব করছে। এমনও হতে পারে—আগামী দিনে সমুদ্রের নিচে কিংবা উপরে গড়ে তুলতে হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাসস্থান, সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনতে হবে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল, কাজে লাগাতে হবে দ্রুত হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার ক্ষুধা মিটাবার জন্য জলজ-উদ্ভিদ ও মৎস্য সম্পদকে।

জলস্থলময় ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল প্রায় 19 কোটি 70 লক্ষ বর্গমাইল। আর এর 7 ভাগের 5 ভাগ জল এবং 2 ভাগ স্থল। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল সম্পূর্ণ গ্যাসীয়। বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে গ্যাসীয় অবস্থা ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করে আজকের এই ভূমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। পরিবর্তনের সময় ক্রমাগত সঙ্কোচনের ফলে ভূপৃষ্ঠ কোথাও উঁচু থেকে খুব উঁচু হয়ে গেছে আবার কোথাও নিচু থেকে খুব নিচুতে নেমে গেছে। এই অতি নিম্নবর্তী অংশে ক্রমশঃ জল সঞ্চিত হয়ে বিশাল জলরাশির সৃষ্টি হয়েছে। গলিত শিলার জল ধারণ করার ক্ষমতা বেশি হওয়ায় এবং পৃথিবীর প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য এই জল জলীয় অণু হারিয়ে অত্যধিক পরিমাণে বাষ্পীভূত না হওয়ার ফলে ভূমণ্ডলে গহ্বরগুলি থাকে জলে পূর্ণ।

প্রকৃতি ও গভীরতা অনুসারে সমুদ্রের তলদেশকে মুখ্যত চার ভাগে ভাগ করা যায়—

যথা -1. উপকূলের নিকটবর্তী অংশ
2. মহীসোপান (অগভীর সমুদ্র)
3. মহীঢাল (গভীর সমুদ্র) এবং
4. সমুদ্রের নিম্নতম অংশ বা তলদেশ

সমুদ্রের তলদেশে বহু বিশাল ভঙ্গিল পর্বতের নিদর্শন আছে। এই সকল ভঙ্গিল পর্বতগুলির শীর্ষদেশ সমুদ্রের বুকে দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জরূপে বিরাজমান।

মহীসোপান অঞ্চলটি অগভীর। সাধারণত এর গভীরতা 600 ফুট বা 100 ফ্যাদম। এই মহীসোপানের সীমাকে মহাদেশের শেষ সীমা বলে বিবেচনা করা হয়। মহীঢাল অঞ্চলটি ঢালু হয়ে ক্রমশঃ সোজা গভীর - সমুদ্র খাতে নেমে যায়। আটলান্টিক মহাসাগরের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মহীঢাল, মহীসোপান ছাড়াও গভীর সমুদ্রের সমভূমি এবং গভীর সমুদ্র খাত দেখা যায়। গভীর সমুদ্রের সমভূমি অংশে দেখা যায় যে এই অংশের গভীরতা প্রায় 2 মাইল এবং এই বিস্তৃত অঞ্চলটি উঁচুনিচু পর্বত দ্বারা গঠিত।

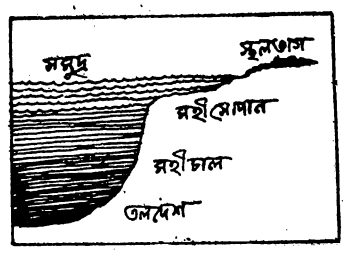

সমুদ্রজলে শতকরা $6\frac{1}{2}$ ভাগ নানা প্রকারের খনিজ লবণ মিশ্রিত আছে। সেগুলি সাধারণ লবণ যা আমরা খেয়ে থাকি। সমুদ্রজলে তার পরিমাণ $2\frac{3}{4}\%$। বিজ্ঞানীদের ধারণা—সমুদ্র সৃষ্টির কালে পৃথিবীর লবণ জাতীয় বহু উপাদান গলে জলে মিশে ছিল। এখনও নদীর স্রোতধারার সঙ্গে কিছু কিছু লবণ এসে সমুদ্রে মিশছে। সাগর জল সাড়ে তিন শতাংশ বিবিধ খনিজ উপাদান দিয়ে গঠিত। তার মধ্যে সাধারণ লবণ থাকে পৌণে তিন শতাংশ। 200 কোটি বছর ধরে ভূত্বকের আগ্নেয় শিলা পচনের ফলে, প্রচুর পরিমাণে জল বাষ্পীভূত হওয়ার ফলে জল লবণাক্ত হয়।

কিন্তু সমুদ্রের জল সকল অংশে সমান লবণাক্ত নয়। যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি অথবা বরফগলা জলে পুষ্ট নদনদী সমুদ্রে এসে পড়ে অথবা জলের বাষ্পীভবন কম মাত্রায় ঘটে সেখানকার সমুদ্রের জল কম পরিমাণে লবণাক্ত হয়। যেমন মেরু প্রদেশের জল বেশি পরিমাণে লবণাক্ত। ভূমধ্যসাগর, মেক্সিকো উপসাগর অপেক্ষা বাল্টিক সাগর ও হাড্‌সন উপসাগরের জল কম লবণাক্ত।

জলের কোন বর্ণ নেই। সূর্যরশ্মি, জলের গভীরতা উদ্ভিদ, মাটি এবং অভ্যন্তরস্থ আগ্নেয়গিরি সমুদ্রের জলের রংকে প্রভাবান্বিত করে।

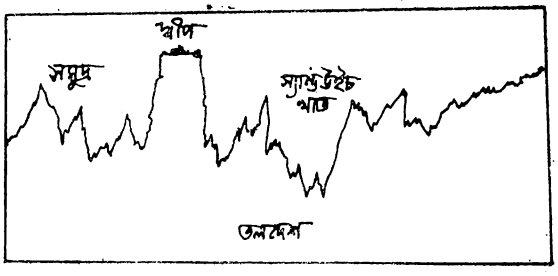

সাগরতলের রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটন করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সমুদ্রজলের স্তরসমূহকে ভেদ করে সূর্যালোক সাধারণতঃ 3000 ফুটের নিম্নে পৌঁছাতে পারে না। সুতরাং জীবনধারণের উপযোগী আলো পাবার জন্য অধিকাংশ সামুদ্রিক জীব 3000 ফুট গভীরতা যুক্ত জলে বাস করে। সমুদ্রের অতি গভীর তলদেশ ঘোর অন্ধকার বলে সেখানে খুব কম সংখ্যক জীব বাস করে। তারা নিজস্ব আলো সঞ্চার করতে সমর্থ। এই বিশাল সমুদ্রে অগণিত ক্ষুদ্র থেকে বিশালাকার জীব বাস করে। এদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপাদান সমুদ্রগর্ভেই সঞ্চিত আছে। উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের জন্য সমুদ্রের ঘাস অর্থাৎ ফাইটোপ্ল্যাংকটন বছরে 20 কোটি টন উৎপন্ন হয়। এছাড়া ভীষণ হিংস্র, বিষযুক্ত, হুলযুক্ত এবং তড়িৎ পরিবাহী দেহযুক্ত জীবও বর্তমান। মানুষের খাদ্য হিসাবে সার্ডিন, হেরিং, স্যামন, কড ও আরও অনেক মাছ বছরে প্রায় 55 মিলিয়ন মেট্রিক টন তোলা হয়। সীল, তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর প্রাণীকেও মানুষ নিজের প্রয়োজনে শিকার করতে মেরুপ্রদেশ পর্যন্ত ছুটে চলেছে। এই সব প্রাণীর হাড়, মাংস, চর্বি এবং চামড়া দিয়ে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

সমুদ্র খাদ্য-লবণ, ম্যাগনেশিয়াম, ব্রোমিন প্রভৃতির আকর। এছাড়া সমুদ্রগর্ভে প্রচুর পরিমাণে কোবাল্ট, তামা, সোনা, রূপা, ইউরেনিয়াম, দস্তা প্রভৃতি নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ আছে যা মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় ও অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর 70% মহীসোপানের ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে টিন, নুড়িপাথর, হীরা ইত্যাদি।

উপকূল ও বহিঃউপকূলে পাওয়া গেছে জ্বালানী গ্যাস ও পেট্রোলিয়ম। প্রায় বছর 20 আগে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ভারত মহাসাগরের মধ্য থেকে জারমোনিয়ম, টাইটানিয়ম প্রভৃতি ভারী পদার্থের আবিষ্কার করেছেন। সমুদ্রগর্ভে বিজ্ঞানীরা তামা, নিকেল ও কয়লাখনির সন্ধান পেয়েছেন। 1620 খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ড উপকূল থেকে সুড়ঙ্গ কেটে সমুদ্র-গর্ভ থেকে কয়লা তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। জাপান প্রায় 8000 ফুট ভূগর্ভ থেকে তার প্রয়োজনের 30% কয়লা উত্তোলন করে। সমুদ্রের নানা আগাছা থেকে তৈরি হয় আয়োডিন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ, উপকূলবর্তী অগভীর সমুদ্রে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রবাল, মুক্তা, সুক্তিও স্পঞ্জের চাষ চলছে।

পৃথিবীর আবর্তন, বায়ুপ্রবাহের চালনা ও ঘনত্বের পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রজলের গতি উৎপন্ন হয়। সমুদ্রজলের এই গতির নাম স্রোত (current)। এই স্রোতের উপর জাহাজ চলাচল সুবিধাজনক হয়েছে। উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকায় পার্শ্ববর্তী দেশে বৃষ্টি হয়। উষ্ণ স্রোতের ফলে পৃথিবীর শীতল দেশের বন্দরগুলো শীতকালে বরফমুক্ত থাকে। শীতল স্রোতের সঙ্গে প্রচুর মাছ আসে এবং উষ্ণ স্রোত ও শীতলস্রোতের মিলনস্থলে মাছগুলি থেকে যায়। ফলে এই সকল স্থানে মৎস্য ব্যবসায় ব্যাপকভাবে বেড়ে উঠেছে।

পূর্ববর্তী আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল সমুদ্র প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কি উপকার করে। এবার আসি আমরা সমুদ্রের কাছে পরোক্ষভাবে কেমন ঋণী? প্রতিনিয়ত মানবসমাজ ও যানবাহন, কল-কারখানা যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ছে তার 60% শোষণ করছে সমুদ্র। তার পরিবর্তে আমাদের সরবরাহ করছে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন। এছাড়া সমুদ্র তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

যে সমুদ্র আমাদের সর্বতোভাবে উপকার করছে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আমরা মানব সমাজ ঠাণ্ডা মাথায় তাকে কলুষিত করছি। সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী উন্নতিশীল দেশগুলির অভ্যন্তরে যে সব রাসায়নিক এবং ওষুধ কারখানা আছে তারা অপ্রয়োজনীয় দূষিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমুদ্রে ফেলছে। এর ফলে জল প্রভূত পরিমাণে দূষিত হচ্ছে। এছাড়া আজ সভ্যতার যুগে জলযান হিসাবে ডিজেল বা পেট্রল চালিত জাহাজকে সমুদ্রের বুকে ভাসাতেই হয়। এই জাহাজ থেকে অপরিশোধিত দূষিত জ্বালানি সমুদ্রে মিশে সমুদ্রের জলকে কলুষিত করছে। সুতরাং দেখা যায় যে আমরা পরোক্ষভাবে নিজেরাই নিজেদের দূষণের মুখে ঠেলে দিচ্ছি।

প্রকৃতির এই অফুরন্ত সম্পদ মানবকল্যাণে ব্যবহারের জন্য এর সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, অবক্ষয় রোধ ও সুবণ্টন একান্ত প্রয়োজন। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ও সীমানা নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

C/o রাধারমণ শেঠ, পোঃ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী-712502.

যোগে সুস্বাস্থ্য

মলয় রায়

তোমরা যারা স্কুলে পড়াশোনা করছ তারা নিশ্চয়ই বুঝেছো যে শুধু পড়াশুনা করলেই ভালো ছেলে-মেয়ে হওয়া যায় না, তার সঙ্গে চাই সুস্থ শরীর, সতেজ মন ও জাগ্রত চেতনা। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—"বসে না থেকে একটু দৌড়াও" আর এই দৌড়াদৌড়ি করলে

আমাদের রক্ত চলাচল দ্রুত হয় আর তখনি আমাদের বুকের দুই পাশে যে দুটো যন্ত্র আছে যার নাম ফুস্‌ফুস্ [LUNG] তার কাজও দ্রুত হয় আর তখন আমরা জোরে জোরে দম নিই, আর দমের সঙ্গে বেশী অক্সিজেন যায় যা শরীরের বিশেষ প্রয়োজন। এবং বুকের মধ্যে আর একটি বিশেষ দরকারী যন্ত্র আছে, তার নাম বলতো কী? তার নাম হৃদ্‌-যন্ত্র [HEART]। যার দ্বারা রক্ত সমস্ত শরীরে যাতায়াত করে, তারও কাজ ভালো হয়। এখন মোটামুটি এইটুকুই জেনে রাখো। এছাড়া সারা শরীরে মাংসপেশীর কাজ হয়, এবং শরীরের সন্ধিস্থলেও কাজ হয়। যাদের দৌড়াদৌড়ি করতে অসুবিধা আছে, তারা মাঠে সকালে হাঁটতে পারো, কেমন, এখন তো আমাদের সরকার তোমাদের স্কুলে যোগাসন পাঠ্যতালিকায় ফেলেছেন। সেইজন্য তোমরাও আসন করছো নিশ্চয়। করলে দেখবে শরীর কতো ভালো থাকবে। আমি তোমাদের মাঝে মাঝে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায় আসন শেখাবো, প্রতিদিন সকালে এইগুলো অভ্যাস করো। আজ বলছি পদ্মাসন। এই আসনে কি করে তোমরা বসবে দেখো,—প্রথমে বসে ডানপা বাঁ পায়ের থাইএর উপর তোলো, পরে বাঁ পা ডান পায়ের থাইয়ের উপর। ব্যাস হয়ে গেলে এইবার শিরদাঁড়া সোজা করে হাত দুটো হাঁটুর উপরে রেখে বসে থাকো। একেই বলা হয় পদ্মাসন। এই আসন তোমরা আমার ছবি দেখে বুঝতে পারছো। এই আসন তোমরা সকালে ও রাত্রে শোবার আগে করবে এবং চিন্তা করবে তোমাদের সারাদিনের ভালো মন্দ কাজের কথা দেখবে তোমরা কতো ভালো ছেলে হচ্ছো। এবং পড়াশুনাও কতো ভালো হচ্ছে, সবাই তোমাকে ভালো বাসছে। তখন কতো আনন্দ হবে বলোতো, এছাড়া হাঁটুর ব্যথাও ভালো হবে।

তাহলে, আজ একটি আসন শিখলে কেমন? আর কি করতে বললাম, সকালে মাঠে দৌড়ানো বা জোরে হাঁটা যার নাম "ভ্রমণ প্রাণায়াম"। লেখাটি কেমন লাগলো তোমরা সম্পাদকীয় দপ্তরে চিঠি লিখে জানিও।

1/1D ন্যায়রত্ন লেন। কলিকাতা—4

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার • রূপায়ন - গৌতম কর্মকার

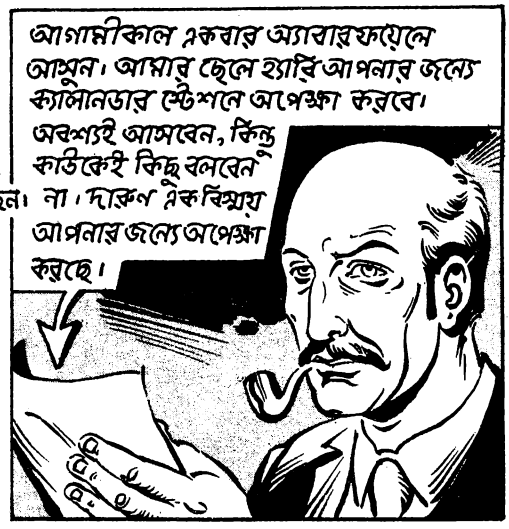

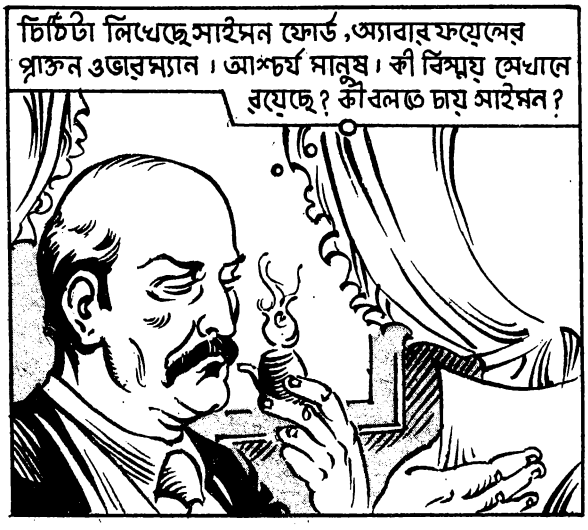

১৮-- খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর। স্থান-এডিনবরা। ইঞ্জিনীয়ার জেমস স্টার প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে ফিরছেন।
স্যার, আপনার চিঠি।
ওহ, তাই নাকি? সকালেই! কই, দাও।
আগামীকাল একবার অ্যাবারফয়েলে আসুন। আমার ছেলে হ্যারি আপনার জন্যে ক্যালানডার স্টেশনে অপেক্ষা করবে। অবশ্যই আসবেন, কিন্তু কাউকেই কিছু বলবেন না। দারুণ এক বিস্ময় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।
চিঠিটা লিখেছে সাইমন ফোর্ড, অ্যাবারফয়েলের প্রাক্তন ওভারম্যান। আশ্চর্য মানুষ। কী বিস্ময় সেখানে রয়েছে? কী বলতে চায় সাইমন?
অ্যাবারফয়েল! পরিত্যক্ত সুবিশাল কয়লাখনি। কয়লার শেষ চাঙাড়টাও ডোচার্ট পিটের তলা থেকে সেদিন তুলে আনা হয়েছিল। দশ দশটা বছর কোথায় কেটে গেছে। এতোদিন পর…
অ্যাবারফয়েলের শেষতম দিনটি বড়ো করুণ। বড়োই হতাশাময়। বিদায়ী শ্রমিকদের সম্ভাষণ জানাচ্ছেন স্টার।
বন্ধুগণ, বড়োই দুঃখের কথা, অ্যাবারফয়েলের জঠর আজ শূন্য। চারপাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কয়লার নতুন স্তর আর মেলেনি।
কতো কাল আমরা মিলে মিশে এখানে কাজ করেছি। আজ যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। বন্ধুগণ, বিদায়!
2

একে একে ফিরে গেল প্লমিকের দলে। রইলো শুধু দু'জন। সাইমন ফোর্ড আর তার কিশোর ছেলে।

চলি সাইমন। এডিনবরায় আমার বাড়ীর দরজা তোমার জন্যে খোলা থাকবে চিরকাল।

এডিনবরা! অনেক দূর মিস্টার স্টার। ডোচার্ট পিট থেকে অনেক দূর!

তার মানে? তুমি কি এখানেই থেকে যাবে নাকি? এখান থেকে যাবে না?

না স্যার, আমি আমার বউ-ছেলে নিয়ে এই খনির মধ্যেই বসবাস করবো।

ওহ, এই পাতালে!

হ্যাঁ স্যার, পাতালে। আমার বিশ্বাস— আপনাকেও এই পাতালেই আবার আসতে হবে একদিন।

সেই সাইমন আজ চিঠি দিয়েছে ইঞ্জিনীয়ারকে।

কী হতে পারে? বড়াই করে বলেছিল- এই পাতালে আবার আসতেই হবে। ধাপ্পা নয়তো?

নানান কল্পনায় সারাদিন ছটফট করলেন স্টার। তারপর···

আবার চিঠি! পুরোনো হলদে কাগজ। হাতের লেখা জড়িয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই এখানে আসবেনা। হয়রানিই সার হবে।

আশ্চর্য! কার লেখা? নিচে কোনও নাম নেই। খামের উপর অ্যাবারফয়েল ডাকঘরের ছাপও তো দেখছি রয়েছে।

কী করা যায়? যাবো, না থাকবো?

নাহ। বুড়ো সাইমনের অনুরোধের দাম অনেক। তাছাড়া ক্যালানডার স্টেশনে কাল সারা দিন তার ছেলে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে লিখেছে। দেখাই যাক না। যেতে দোষ কী?
৪ঠা ডিসেম্বর। রেলপথে নিউ হ্যাভেন গ্রামে পৌঁছে 'প্রিন্স অব ওয়েলস' স্টিমারে উঠলেন স্টার।
স্টিমার চলতে শুরু করেছে। ঘন্টাতিনেক পরেই স্টারলিং পৌঁছে যাবে মনে হয়। তারপর আবার ট্রেন।
ক্যালানডার স্টেশন। যথাসময়ে পৌঁছে গেলেন স্টার।
গুড মর্নিং স্যার। আপনিই তো মিস্টার...
ও-হ্যাঁ, জেমস স্টার, ইঞ্জিনীয়ার। তুমিই তো হ্যারি?
হ্যাঁ স্যার।
তোমার বাবা ভালো আছেন তো? মা?
হ্যাঁ স্যার, খুউব ভালো।
তোমরা কি এখনো খনির মধ্যেই বসবাস করছো?
হ্যাঁ স্যার। বাবাকে তো চেনেন। খনিতেই তাঁর জন্ম, মরতেও চান খনিরই মধ্যে।
ওহ, বারো মাস সরগরম থাকতো এই পথ। এখন ধূ ধূ করছে মাঠ। যেন মরুভূমি। দূরে ঐ টিলাটা·· হ্যাঁ, ঐ তো ইয়ারো শ্যাফ্ট·· লোহার ফ্রেম·· বিরাট চাকা··· সব ভাঙা···
4

অস্ত্র

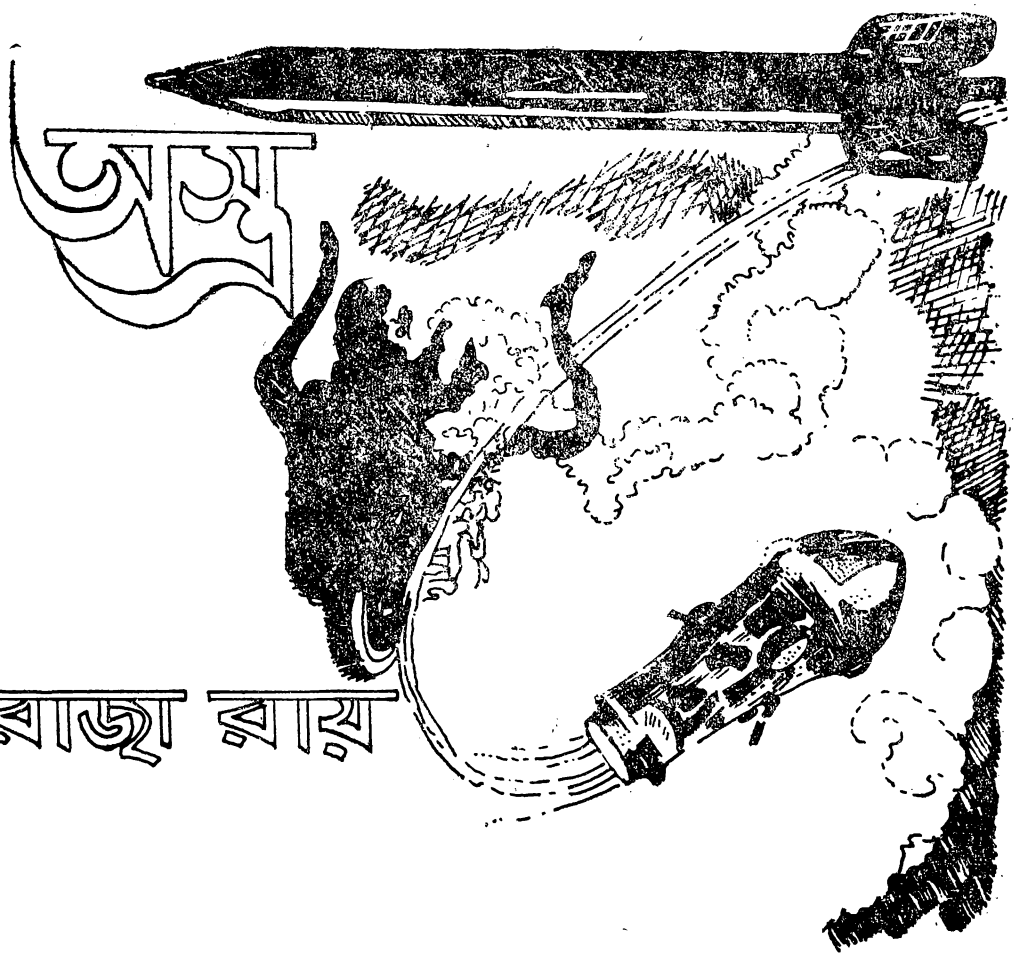

রাজা রায়

আমি জানতাম যে মাঝে মধ্যে ওরা সেনাবাহিনী থেকে একজনকে ডেকে নেয়। বিশেষ করে যখন এমন সমস্যা আসে যার সমাধান আমাদের ক্ষমতার বাইরে। সকলেই জানে ওরা সৈনিকদের দেখতে পারে না। বোকা বানিয়ে মজা দেখে। এবার তাহলে আমার পালা। আমি মানে জেনারেল কার্ল স্যাণ্ডস।

ওরা? ওরা হল ডিফেন্স হেডকোয়ার্টারে বিজ্ঞানীদের গ্রুপ। প্রোফেসর নরউড ওদের নেতা। বরাবরই ওদের ধারণা যে সেনাবাহিনীতে আর সৈনিকদের দরকার নেই—যুদ্ধবিজ্ঞান এমন একটা পর্যায়ে পেঁাছে গেছে যে রকেট, মিসাইল, বোমা সবই স্বয়ংক্রিয়, খালি বোতাম টেপার ওয়াস্তা! মনে মনে আমরাও এটা জানি বলেই আমাদেরও এত রাগ ওদের উপর।

যা হোক, প্রোফেসর নরউডের ঘরে গিয়ে পেঁাছলাম। আর্মি থেকে আমি একাই। তবে বেশ কজন উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান ছিলেন, দু-চার জন রাজনীতির লোকও। সকলের মুখেই একটা প্রত্যাশার ভাব। এটা কি তাহলে একটা বেশ বড় ব্যাপার?

প্রোফেসর নরউড উঠে দাঁড়ালেন। "ভদ্রমহোদয়গণ, দু চারটে কথা বলে রাখা দরকার। আমি এবং আমার সহকর্মীরা ব্যাপারটা জানি। আপনারা অনেকেই জানেন না। মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই যে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। এর সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক মারণাস্ত্রের ভবিষ্যৎ জড়িত।" আমরা একটু নড়ে বসলাম।

"আমাদের বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। হ্যাঁ, ঠাট্টা নয়। তাঁর ছবি দেখে আমরা নিশ্চিত

হলাম যে লিওনার্দো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন। তা নইলে আকাশ-যান, সাবমেরিন, অটো-গাইরো, লেদ মেশিন—এ সবের ছবি তিনি পাঁচশো বছর আগে আঁকলেন কি করে? এই সময়েই প্রোফেসর ডান ও তাঁর সহকর্মীরা স্বপ্নের উপর কাজ করেন ও প্রমাণ করেন যে স্বপ্নের মাধ্যমে অনেকে ভবিষ্যতের এক ঝলক দেখতে পায়। আমাদের গবেষণার কাজ এরই উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ডানের কাজ সম্বন্ধে একটা পেপার ব্যাক আমারও পড়া ছিল। এবার বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ব্যাপারটা কি?

"স্বপ্নের মাধ্যমে যদি ভবিষ্যৎ জানা যায় তবে ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটা ধরা-বাঁধা ছকের মধ্যে আনতে পারলেই পাব আমাদের কাজের টাইম মেশিন। আর আজ তো আমরা অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী। যদি পাঁচ-দশ বছর ভবিষ্যতের অস্ত্রও আমরা আজ দেখতে পাই, তার সুবিধা বিজ্ঞানী আর কারিগরদের কাছে অপরিসীম।"

এক ঢোঁক জল খেয়ে প্রোফেসর নরউড বললেন, "সরকারী আনুকূল্যে নানা মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে আমরা ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ক্ষমতা আছে এরকম কয়েকটি ছেলেকে বেছে নিয়েছি। দেখা গেছে যে সকলের ক্ষমতা সমান নয়—তেমনি এক একজনের স্বাভাবিক ক্ষমতাও এক এক দিকে। পাঁচ বছরের চেষ্টায় আমরা একজনকে বেছেছি যার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ক্ষমতা দুটোই আছে। আমরা চাই মারণাস্ত্রের নক্শা। তাই দুবছর ধরে ছেলেটিকে ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানশিপ্‌ শিখিয়েছি।"

একটু থেমে প্রোফেসর বললেন "সাত বছর পরে আজ আমাদের সাফল্যের দিন। পাশের ঘরে রুডল্‌ফ্‌ লেটনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। হিপ্‌নোসিসের সাহায্যে তাকে বলা হয়েছে যে আজ থেকে একশ বছর পরের মারণাস্ত্রের নক্সা সে আঁকবে। এতক্ষণে সে নক্সা তৈরি হয়েছে। 2064 সালের মারণাস্ত্র আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। চলুন, পাশের ঘরে গিয়ে আমরা দেখি। তবে হাঁ, এটা খুবই সম্ভব যে নক্সাটা দেখেও আমরা ঠিক বুঝতে পারব না। অ্যানালিস্টদের খাটতে হবে অনেক।"

পাশের ঘরে যাবার সময়ে মুচকি হেসে প্রোফেসর নরউড আমাকে বললেন, "জেনারেল, আপনাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ঐ ব্রহ্মাস্ত্র আমাদের হাতে এলে আর সেনাবাহিনীকে কেউ পুঁছবেও না।" উত্তর দিলাম না।

পাশের ঘরে ঢুকে দেখি কৌচের উপর শুয়ে আছে নয় বছরের একটি ছেলে। হাতে তার কাগজ পেনসিল। তখনো আচ্ছন্নের মতন হয়ে আছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হল। কুড়ি জোড়া চোখের নজর ঝুঁকে পড়ল কাগজটির উপর। খানিক পরে কিছুটা নিরাশ হয়ে সরে এলেন সকলে—এ কি রকম অস্ত্র? একটা বড় ক্রস, তার পাশে লতানে কি যেন ঝুলছে!

প্রোফেসর নরউড বললেন, "আসলে আমরা এত আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামের জন্য তৈরি নই। আমাদের অ্যানালিস্টদের অনেক খাটতে হবে। তবে এ রহস্য ভেদ করা যাবে।"

জনৈক মন্ত্রী বললেন "এ কি ছেলেখেলা? বাচ্চাটা কিসের না কিসের ছবি এঁকেছে। এটা যে অস্ত্র তার প্রমাণ কি?"

এবারে ঘুরে দাঁড়ালাম, "না স্যার, এটা সত্যই অস্ত্র আর 2064 সালের সবচেয়ে বিধ্বংসী অস্ত্র। আর আমাদের পরিচিতও বটে। ঠিক ঠিক বই পড়া থাকলে কারুরই চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়।"

এবার সব চোখের নজর আমার উপরে। কি, বিজ্ঞানীরা ঠিক বই পড়ে না? প্রোফেসর নরউড-মার্কা মুচকি হেসে তাঁকেই বললাম "পুরানো ছবিওয়ালা 'আইভান হো' বইটা পড়লেই দেখতেন যে এ আমাদের বহু পরিচিত স্যাক্সন যুগের ক্রস বো। বর্তমান ধনুকের পূর্বপুরুষ।"

ভাঙা গলায় প্রোফেসর নরউড বললেন, "তীর ধনুক! তবে কি……তবে কি?"

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ প্রোফেসর, আপনার ধারণাই ঠিক। আপনাদের বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 2064 সালে ক্রস-বোই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্বল দাঁড়াবে। তবে আপনার জন্য আরো বড় এক দুঃখ অপেক্ষা করছে—ক্রস বো চালাতেও সৈনিক দরকার। দুঃখিত, আর দাঁড়াতে পারছি না।"

এ কথা বলেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম। ওরা এখনো ভাবছে।

[বিদেশী বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের ছায়া অবলম্বনে]

মহাবিশ্বকে যেমন আমরা দেখি

মৃণ্ময়ী দাস

রাতের অন্ধকারে নির্মেঘ আকাশের দিকে চাইলে তারকাখচিত আকাশে যেন স্বর্গের শোভা দেখা যায়। ভাববে তোমরা হয়ত কোটি কোটি তারা দেখছ, কিন্তু আসলে খালি চোখে মাত্র ছয় হাজারের মত তারা দেখা যায়। আবার কোন সময়ে একসঙ্গে তিন হাজারের বেশি তারা দেখা যায় না। কখনো দেখা যায় কোটি কোটি তারার এক একটি ঝাঁক এক একটি অঞ্চল জুড়ে থাকে। এইরকম এক একটি তারার ঝাঁককে বলা হয় এক একটি তারাজগৎ বা নক্ষত্রমণ্ডল বা সংক্ষেপে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এইরকম অনেকগুলি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল কিভাবে? এ সম্বন্ধে কয়েকটি মতবাদ আছে। প্রত্যেকটি মতবাদকে সমর্থন করে বৈজ্ঞানিক তথ্যও আছে। বলিষ্ঠ মতবাদটি হল 'বিগ্‌ব্যাং' বা 'মহাবিস্ফোরণ বাদ'। এই মত অনুসারে সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন ছিল শূন্য এবং ঘনত্ব ছিল অপরিসীম। প্রায় 1500 কোটি বছর আগে এই অকল্পনীয় ঘন পিণ্ডে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল, যার ফলে পিণ্ডটি টুকরো টুকরো হয়ে প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। নানান বিবর্তনের মাধ্যমে এদের থেকে তৈরি হয় কোটি কোটি নক্ষত্র এবং নাক্ষত্রিক বস্তু।

একইভাবে এক একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব নক্ষত্রজগৎ। আমাদের সূর্য একটি নক্ষত্র। সৌরপরিবারের 9টি গ্রহ তাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে তাদের নির্দিষ্ট পথে। গ্রহগুলির অনেকেরই এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে, যারা আবার নিজের নিজের গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। স্বভাবতই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে অন্য কোনও নক্ষত্রের কি সূর্যের মত গ্রহ আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন বার্নার্ড নক্ষত্রেরও গ্রহ আছে। বহু নক্ষত্র আবার জোড় বেঁধে থাকে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এদের বলা হয় 'ডাবলস্টার' বা 'নক্ষত্রজোড়'। বার্নার্ড নক্ষত্রটিকে আমাদের সূর্যের জুটি নক্ষত্র বলে মনে করা হচ্ছে। গ্রহ ছাড়াও নক্ষত্রজগতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য অ্যাস্টরয়েড অর্থাৎ ক্ষুদ্রগ্রহ বা গ্রহাণু। এই গ্রহাণুগুলিও গ্রহের মতই তাদের নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে চলে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানের 770 কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট গ্রহাণু 'সিরেস' সূর্যকে অন্যগ্রহগুলির মতই নির্দিষ্ট পথে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সৌরপরিবারে আরও অনেক গ্রহাণু আছে।

নক্ষত্রগুলির মধ্যে যে আন্তর্নাক্ষত্রিকজগৎ, তা কি শূন্য? তা নয়, নক্ষত্রের মতই এই অঞ্চলের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন, আর আছে হিলিয়াম, ধূলিকণা প্রভৃতি। গত 15 বছরে এই আন্তর্নক্ষত্রজগতে অন্তত 60 রকমের অণুর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে যেমন আমাদের অতি পরিচিত কার্বন মনক্সাইড, ইথাইল অ্যালকোহল আছে, তেমনই আছে বিশাল ও বিচিত্র গঠনের নানান অণু, যেমন CH_3C_3N CH_5N, $HC_{11}N$ প্রভৃতি। এই সব অণুর অনেকগুলিই এখনও পৃথিবীর গবেষণাগারে তৈরি হয় নি। এরা ছাড়াও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে আছে ধূমকেতু, উল্কা, কোয়াসার প্রভৃতি মহাজাগতিক বস্তু।

নক্ষত্রেরও আবার নানান পরিণতি আছে। নক্ষত্রের, যেমন আমাদের সূর্যের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন শতকরা প্রায় 96 ভাগ। এর পর যে উপাদান বেশি, তা' হল হিলিয়াম। তাপ পারমাণবিক সংযোজনের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে নক্ষত্রের হাইড্রোজেন ক্রমশঃ হিলিয়াম, কার্বন, অক্সিজেন, নিয়ন, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, আয়রন, সীসা, বিসমাথ প্রভৃতি মৌলে পরিণত হতে থাকে। কখনও বা বাইরের গ্যাসীয় স্তরের আয়তন বেড়ে যাওয়ায় নক্ষত্রের তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং ঔজ্জ্বল্য কমে গিয়ে নক্ষত্রটিকে লালচে দেখায়। নক্ষত্রটিকে তখন 'রেড জায়েণ্ট' বা 'লালদৈত্য' বলা হয়। বাইরের গ্যাসীয় স্তর সৌরঝড়ে উড়ে গিয়ে নক্ষত্রটি যখন চুপসে যায় এবং কেন্দ্রবস্তুতে পরিণত হয় তখন তাকে বলা হয় 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' বা 'শ্বেতবামন'। আবার বিশেষ ভরযুক্ত নক্ষত্র আয়তন কমে ও ঘনত্ব বেড়ে অকল্পনীয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি-সম্পন্ন এবং কয়েক কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন কিন্তু একই ভর বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাবয়ব নক্ষত্র 'ব্ল্যাক হোল' অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বর বা 'কালোবামনে' পরিণত হয়, যা সবকিছুকেই নিজের মধ্যে টেনে নেয়। নক্ষত্রের পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটতে ঘটতে শেষ পরিণতি হিসাবে নক্ষত্রের কেন্দ্রের প্রোটনটি পড়ে থাকে, যা বাইরের ইলেকট্রনকে টেনে নিয়ে নিউট্রন সৃষ্টি করে, তখন নক্ষত্রটি হয় 'নিউট্রন স্টার'। এছাড়াও এক্সরে নক্ষত্র, রেডিও নক্ষত্র, নোভা, সুপারনোভা প্রভৃতি নক্ষত্রের নানান অবস্থা আছে। আমরা পরে এদের নিয়ে আলোচনা করব।

জেনে রাখো

আলোক বৎসর ঃ আলোক বৎসর জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরত্ব মাপার একক। এক আলোক বৎসর বলতে বোঝায় আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে সেই দূরত্ব।—এটা প্রায় $9{\cdot}6 \times 10^{12}$ কিলোমিটার।

ডাবল স্টার ঃ নক্ষত্র জোড় বা যুগ্ম নক্ষত্র। এ ক্ষেত্রে দুটি নক্ষত্র একই মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রকে ঘিরে পরিক্রমণ করে। মহাকাশে এই যুগ্ম নক্ষত্রগুলিকে খালিচোখে একটি নক্ষত্রের মত দেখায়। সূর্যের কাছের বার্নার্ড নক্ষত্রকে সূর্যের যুগ্মনক্ষত্র বলে মনে করা হয়।

ভ্যান্ অ্যালান রেডিয়েশান বেল্ট ঃ 1958 সালে জে· ভ্যান্ অ্যালান্ মহাকাশযান এক্সপ্লোরার—1 এর অভিযানের সময় পৃথিবীর কাছের এবং পরে পাইওনিয়ার—3 এর অভিযানের সময় দূরের দুটি আচ্ছাদন আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বন্দী হওয়ায় বৈদ্যুতিক ধর্ম সম্পন্ন কণার দ্বারা তৈরি দুটি বেল্ট বা আচ্ছাদনী পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। কাছের আচ্ছাদনীটি পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে 2400 থেকে 5600 কিলোমিটারের মধ্যে বিস্তৃত। মহাজাগতিক রশ্মি এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কণিকা মুখ্যত প্রোটন, ইলেকট্রন, আলফাকণা প্রভৃতি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর অবিরত বর্ষিত হয়ে চলেছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে ধরা পড়ে এবং পৃথিবীর বায়ুকণার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এই রশ্মি ও কণা বিভিন্ন গৌণ কণার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর কাছের বা অন্তঃভ্যান অ্যালান বিকিরণ বেল্ট এই কণাগুলিকে বন্দী করে সৃষ্টি হয়েছে। দূরের বা বহিঃভ্যান্ অ্যালান বেল্টটি পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 11200 থেকে 19200 কিলোমিটার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সূর্য থেকে ছুটে আসা ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতির কণা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে ধরা পড়ে এটি সৃষ্টি করেছে। এই দুটি আচ্ছাদনী মহাকাশ থেকে আসা ক্ষতিকর কণিকা ও রশ্মির হাত থেকে জীবজগতকে রক্ষা করে চলেছে।

বিজ্ঞান সমাবেশে ভাষণরত প্রধান অতিথি ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। বাঁদিক থেকে সুধাংশু পাত্র, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধীরেন্দ্রলাল ধর এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণ। ছবি ঃ কল্যাণ চক্রবর্তী।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই

পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময় ॥ জয়ন্ত বসু ॥ প্রকাশক : শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা-9 মূল্য : পনের টাকা :

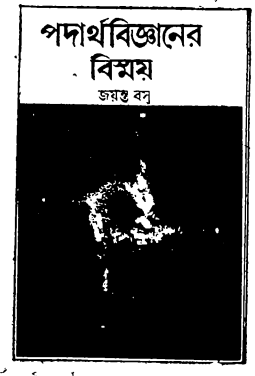

চৌদ্দটি অধ্যায় যুক্ত এই গ্রন্থে লেখক অতি স্বচ্ছ ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করেছেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপরে : পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ, পদার্থের তুরীয় অবস্থা, প্লাজমা, সংযোজন চুল্লী, এম. এইচ. ডি. জেনারেটার, টেলিভিশন মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডার লেসার কম্পিউটারের আত্মকাহিনী, ছাপা সার্কিট, ইলেকট্রনিক্সের জগতে লিলিপুট, চিকিৎসায় ইলেক্ট্রনিক্স এবং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

একশো এগারো পৃষ্ঠার এই বইখানি একবার পড়তে শুরু করলে ছেড়ে ওঠা যায় না, তার কারণ বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য এবং লেখকের 'পপুলার সায়েন্স' বাংলায় লেখার মুন্সীয়ানা। বলা বাহুল্য যে কটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তার সব কটিই সাধারণ মানুষের কৌতূহল উদ্রেক করে। লেখক অত্যন্ত সহজভাবে বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

লেখকের 'প্লাজমা' অধ্যায় থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের এই তিনটি অবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থের বেশির ভাগ, বলা যেতে পারে শতকরা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি, যে বিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে, তাদের আমরা কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় এদের কোনটিই বলতে পারি না। বরং বলা চলে, সেটা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। নাম 'প্লাজমা'.....কঠিন পদার্থকে ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত করলে প্রথমে তা তরল এবং পরে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যেমন বরফ থেকে জল, জল থেকে বাষ্প। ঐ বাষ্পেরই উষ্ণতা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দিলে, তা পরিণত হবে প্লাজমায়।

লেখকের এই সহজ সরল প্রসাদগুণ বিফলে যায় নি। ডক্টর বসু এই গ্রন্থ রচনার জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদাস পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। বাংলার বিজ্ঞান সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি এক অমূল্য সংযোজন

পদার্থ বিজ্ঞানে বিপ্লব : এ. এম. হারুন-অর-রশীদ ॥ প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ মূল্য : পঞ্চাশ টাকা।

পদার্থ বিজ্ঞানের গত ষাট বছরের যুগান্তকারী কিছু ধারণা বাংলায় উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা দুঃসাহসিকই বটে। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপরিচয় বইটি লিখেছিলেন বিজ্ঞানে যাদের দাঁত ওঠেনি তাদের জন্যে। পঞ্চাশ বছর পরেও দন্তহীনদের প্রশ্রয় দেয়া আমি সঙ্গত মনে করি না।"

লেখক সত্যিই সে প্রশ্রয় দেন নি। মোট তেরোটি অধ্যায়ে লেখক তাঁর গ্রন্থটি রচনা সম্পূর্ণ করেছেন। তাতে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও বসু পরিসংখ্যান, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব, নীল্‌স বোর পদার্থ বিজ্ঞানের একটি অবিস্মরণীয় নাম, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পঞ্চাশ বছর, মৌলিক বস্তুকণা, রূপ রস বর্ণ ও গন্ধের বিচিত্র কোয়ার্ক জগত, আবদুস সালামের নোবেল পুরস্কার, নোবেল পুরস্কারে মহাবিস্ফোরণ, জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত, তারার মৃত্যু, ঊষালগ্নের বিশ্ব, কণাজগতের নন্দনতত্ত্ব এবং দেশ-কালের মাত্রা কি 506 ?

গ্রন্থটি নানা দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমতঃ গ্রন্থটি তাঁদের জন্যেই লেখা, যাঁরা বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন। 'ঊষালগ্নের বিশ্ব', অধ্যায় থেকে কিছু অধ্যায় উদ্ধৃত করছি। "বিশ্ব প্রতিসাম্যের অবস্থা থেকে বিবর্তিত হতে থাকলে তার শক্তি ঘনত্বের রাশিতে দুটো অংশ দেখা যায়। একটা অংশ হলো সাধারণ তাপ-বিকিরণের অংশ যা স্টিফানের সূত্র থেকে আসে (বিকিরণ প্রভাবিত বিশ্ব)। দ্বিতীয় অংশটি একটি ধ্রুব সংখ্যা যা প্রতিসাম্যের এবং প্রতিসাম্য ভঙ্গনের অবস্থার শক্তি ঘনত্বের পার্থক্য।"—সাধারণ মানুষের পক্ষে এ ধরনের উক্তি আত্মস্থ করা প্রায় অসম্ভব। আবার রূপ রস ও গন্ধের বিচিত্র কোয়ার্ক জগত অধ্যায় থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "যে সব বস্তুকণার ঘূর্ণন পূর্ণ-সংখ্যক তারা বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে এবং এই পরিসংখ্যান, অনুসারে যে কোন অবস্থায় অসীম সংখ্যক বস্তুকণা থাকা সম্ভব।"— বলা বাহুল্য, এ সব উক্তি বিজ্ঞান না জানা মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

অধ্যাপক সত্যেন বসুকে অ্যালবার্ট আইন-স্টাইনের স্বহস্তে লেখা একটি চিঠির অনুলিপি গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

—অমরনাথ রায়

বিজ্ঞান সমাবেশে

আলোচনা, পুরস্কার ও প্রদর্শনী

আজকের বিবেকবান খুদে পাঠকদের জানবার কৌতূহল ও আগ্রহ অসীম। শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ না রেখে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার উচিৎ মহাবিশ্বের সব খবরই তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত বিজ্ঞান সমাবেশে এ কথাগুলি বলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। গত 18ই এপ্রিল মহাবোধি সোসাইটী হলে স্বপ্না চৌধুরীর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয় বৈশাখের পড়ন্ত বিকেলে।

ছোটদের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে অগ্রজ বিজ্ঞান লেখকদের কথা স্মরণ করে বর্ষীয়ান বিজ্ঞানভিত্তিক লেখক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য আজকের দিনের লেখকদের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অরূপরতন ভট্টাচার্য বলেন, বিজ্ঞান শুধু যেন রসহীন রচনায় না পরিণত হয়, তাতে যেন আনন্দেরও অবকাশ থাকে। 'শিশু সাহিত্যে বিজ্ঞান' এই আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন বিমান বসু, সঙ্কর্ষণ রায়, সূর্যেন্দু বিকাশ কর মহাপাত্র, সমরজিৎ কর, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্কর ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও লেখকগণ।

অনুষ্ঠানে শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য শৈব্যা পুস্তকালয় প্রদত্ত রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার এবং ছোটদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পুরস্কার অর্পণ করা হয় শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ও শ্রীসুধাংশু পাত্রকে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ছিল—বাংলায় প্রকাশিত পত্র পত্রিকা ও খুদে বিজ্ঞানীদের তৈরি মডেলের প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে প্রধান অতিথি ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের ছেলেবেলায় এত বইপত্র ও অন্যান্য সুযোগ ছিল না। তবুও আজকের দিনের ছেলে-মেয়েদের অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক মেটাতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রকাশিত 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' সিরিজের একগুচ্ছ রঙ্গীন আকর্ষণীয়

বিজ্ঞান সমাবেশে বাঁদিক থেকে সুধাংশু পাত্র, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, অনুষ্ঠান সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রলাল ধর

পোস্টার সভাকক্ষের পরিবেশকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছিল। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বিজ্ঞানের পত্র পত্রিকাও প্রদর্শিত হয়।

এরপর প্রায় এক বছর ধরে সিনিয়র-জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, সিনিয়র-জুনিয়র ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট, আইকিউ টেস্ট – প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের মানপত্র পুরস্কার অর্পণ করা হয়। মডেল প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বাচিত হয় নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র, সুরজিৎ সাহা ও মলয় খাটুয়া। মডেল প্রতিযোগিতায় বিচারক মণ্ডলী ছিলেন, পার্থ সারথি চক্রবর্তী, দিবাকর সেন, অমরনাথ রায় ও জয়ন্ত দত্ত। বিশিষ্ট রৌপ্য ব্যবসায়ী পি. সি. দাস অ্যাণ্ড ব্রাদার্স শ্রেষ্ঠ মডেল নির্মাতা হিসাবে নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্রকে একটি বিশেষ পদক উপহার দেন।

স্বাগত ভাষণে সম্পাদক রবীন বল কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীর বিশেষ অতিথি হিসেবে আজকের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসতে না পারায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন প্রধান অতিথি ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমরনাথ রায়। তিনি বলেন, দূরদর্শন, আকাশবাণী, পঃ বঃ সরকার ও বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। লেখক অভিভাবক এবং পাঠকদের সহযোগিতাতেই আজকের অনুষ্ঠান সফল হয়েছে।

—কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস 1987
ক্যুইজ প্রতিযোগিতা
(সহযোগিতায় আই. পি. এইচ. ই)

পরিবেশ, আশ্রয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হবে ক'লকাতায় আগামী বিশ্ব-পরিবেশ দিবসের (5ই জুন 1987) আগেই। বাংলা ভাষায় এই ক্যুইজ হবে। যারা নিজের খরচায় কলকাতায় এসে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে তারাই তাদের নাম ঠিকানা (প্রতি দলে দুইজনের নাম থাকবে) পাঠাবে 11ই মে 1987 এর মধ্যে।

গ্রুপ "ক"– স্কুলের ছাত্রছাত্রী (দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী। গ্রুপ "খ"—কলেজের ছাত্রছাত্রী।

প্রবেশ মূল্য নেই। যোগাযোগ করতে হবে ঃ

শিশির কুমার নিয়োগী, সহ-সভাপতি, বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন
303/2 বি, বিধান সরণী, কলকাতা-700006

গণবিজ্ঞান আন্দোলনে : উৎস মানুষ

28-29 মার্চ 'উৎস মানুষ'-এর উদ্যোগে উত্তর কলকাতায় একটি সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলন নয় উদ্যোক্তারা এর নাম দিয়েছিলেন আড্ডা। আড্ডা বলতে যে খোলামেলা পরিবেশ—হাসি, গল্প, আলোচনা, গান আমরা বুঝি 'উৎস মানুষ'-এর পরিচালকমণ্ডলী ঠিক সেই আমেজেই সকলকে একটা জায়গায় জড়ো করতে চেয়েছিলেন। পোষাকী ভাষায় একে কী বলব? তাঁদের উদ্দেশ্য সার্থক? সফল? সে যাই হক 200-রও বেশী বিজ্ঞান কর্মী এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তরুণরাই বেশী। ছিলেন ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, তাপস সেনের মত প্রবীণ বিজ্ঞানুরাগীরাও। 'উৎস মানুষ' একটিপত্রিকার নাম। গুটি কয়েক বন্ধু-বান্ধব মিলে 7 বছর আগে (1980) 'মানুষ' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। তাই পরে 'উৎস মানুষ' নাম নিয়ে কিছু মানুষকে নাড়া দেয়। এই আড্ডা তারই একটা প্রত্যক্ষ রূপ।

'উৎস মানুষ' পত্রিকাটি কেমন? এর উত্তর এঁদের প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের দিকে তাকালেই পাওয়া যাবে। যেমন, বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞার, বিজ্ঞান জ্যোতিষ-সমাজ, শেকল ভাঙ্গা সংস্কৃতি ইত্যাদি। বিজ্ঞান, অলৌকিকত্ব প্রভৃতির নাম করে যে সমস্ত ধ্যান ধারণা, আচার-আচরণ আমাদের যুক্তি, বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে 'উৎস মানুষ'-এর লড়াই সেগুলির সাথে।

এ কাজগুলি করতে গিয়ে 'উৎস মানুষ'-এর পরিচালকরা এই ক' বছরে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, হচ্ছেন। এমন কি, কখনো তার অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাঁরা নিজেরাই এসবের নির্ধারক হতে চান না। অনুরাগী পাঠকদেরও এসবের অংশীদার করতে চান। তাই তাঁরা এরকম খোলামেলা আলাপের আয়োজন করলেন। এখানে পরিচালকরা যেমন 'উৎস মানুষ' এর সমস্যা ও তার নানান সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করলেন, তেমনি উপস্থিত অনুরাগীরাও কী চান, কী চান না, কোথায় তাঁদের ক্ষোভ, অনুযোগ এবং ভালবাসা একেবারে খোলামনে জানালেন।

তবে, উদ্যোক্তারা শুধু নিজেদের সমস্যার মধ্যেই সকলকে আটকে রাখতে চান নি। বিজ্ঞান মনস্কতা, গণবিজ্ঞান আন্দোলন, বিভিন্ন বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়েই এখানে আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই বক্তারা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এতে ব্যক্তিগতভাবে, সংস্থাগতভাবে একে অপরকে বোঝার, জানার একটা সুযোগ। এ ধরনের আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সংগঠনগুলি নিজেদের মধ্যে যদি একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে পারেন তাতে গণবিজ্ঞান আন্দোলনই লাভবান হবে। 'উৎস মানুষ' তারই একটা প্রস্তুতি করে দিলেন এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় ঘটনা।

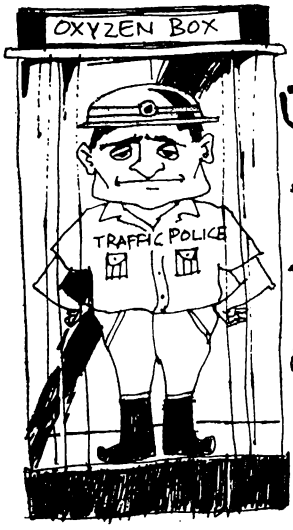

অক্সিজেন নিয়ে বিভ্রাট

কৌশিক ভট্টাচার্য

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শতকরা 20 ভাগের সামান্য কিছু বেশি অক্সিজেনে পরিপূর্ণ। বোঝাই যায় অক্সিজেনের প্রয়োজনীয় সংস্থানের কোন অভাব নেই। প্রকৃতি অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য এক অদ্ভুত উপাদানের সৃষ্টি করেছেন— হিমোগ্লোবিন যা অতি সহজেই অক্সিজেনকে ফুসফুস থেকে গ্রহণ করে প্রথমে রক্তে পরে কোষে অঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে মাত্র দু সেকেণ্ডের মধ্যে। কোন কোন কলা-অঙ্গ ঐ সুযোগেই কিছু অক্সিজেনকে সঞ্চয় করে রাখছে তাদের ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা ভেবে। যেমন ধরা যাক বিশেষ করে পেশী হাত-পা বা পাখিদের ক্ষেত্রে ডানার পেশীগুলি তাদের চলাফেরার সময় খুব বেশি করে কাজ করে। কাজেই সঞ্চিত অক্সিজেন তাদেরকে ক্লান্তির হাত থেকে রক্ষা করে। এবার অক্সিজেন কিরকম সমস্ত বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে আলোচনা করি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর জমজমাট শহর জাপানের টোকিও। সারাদিন এত গাড়ি চলে যে গাড়ির ধোঁয়ায় টোকিও একেবারে ধোঁয়াকার। শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড আর মনোক্সাইড পূর্ণ এই শহরের বাতাস। এতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হল ট্রাফিক পুলিসের। তাদের কর্মক্ষমতা কমে যেতে লাগল। কার্যকালের মেয়াদ ফুরোবার আগেই মৃত্যু হতে লাগল। তখন জাপান সরকার অসুবিধাটা অনুভব করে ব্যবস্থা নিলেন। রাস্তার মাঝে মাঝে অক্সিজেন মেশিনের ব্যবস্থা করলেন। শুধু ট্রাফিক পুলিস নয়, পথ-চারীরাও এতে উপকৃত হ'ল। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন বড় শহরে এই ব্যবস্থা চালু। আচ্ছা, কলকাতায় এই মেশিন বসানো দরকার নয় কি?

এবার একটু অন্য কথা বলি। তিমি মাছ জলের তলায় প্রায় ঘণ্টাখানেক থাকতে পারে, অ্যালিগেটার বলে যে কুমীর মিসিসিপি নদীর জলে দেখা যায় তারা নাকি দু ঘণ্টা পর্যন্ত জলের তলায় থাকে, জলের তলায় তো অক্সিজেন নেই তবে এরা অক্সিজেন পায় কোথা থেকে? এরা এদের অক্সিজেন অনেক সঞ্চয় করে রাখে আর পেশী হিমোগ্লোবিনের সহায়তায় এরা ঐ অক্সিজেনকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে আছে।

পৃথিবীর এমন কিছু অঞ্চল আছে যেখানে অক্সিজেন খুব কম, তাই ঐ সব জায়গায় যে কোন প্রাণীর বসবাস খুবই কষ্টকর। কিন্তু ইল মাছের (যাকে ইলেকট্রিক ইল বলা হয়) সে সমস্ত জায়গাতে কোন অসুবিধা হয় না। অনেকটা কফির মতো মাটির রং যেখানে সেই সমস্ত এলাকায় ইলেরা লুকিয়ে থাকে। আর ঐ সময় তাদের নাকের ডগা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না। আর যেখানে তারা থাকে তার চারদিকে জলবেষ্টিত থাকে। তারা ঐ জল দিয়ে সমস্ত ছোটখাট প্রাণীদেরকে আকর্ষণ করে। এবার আকর্ষিত প্রাণীদেরকে দেহসৃষ্ট বিদ্যুতের সাহায্যে হত্যা ও ভক্ষণ করে।

কিছু ব্যাকটিরিয়ার জন্য কোন কোন স্থানে অক্সিজেন শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই ব্যাকটিরিয়ারা অনেক অক্সিজেন নষ্ট করে। এক পরিসংখ্যানে দেখি, 1 মিলিগ্রাম ব্যাক-টিরিয়া ঘণ্টায় 200 ঘন মিলিলিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে। এর ফলে তার চারপাশের প্রাণীদের ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে।

কিন্তু সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীতে জীবের যখন সঞ্চার হয়েছিল তখন বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম ছিল। প্রাণীরা সেই পরিবেশেই নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছিল। কিন্তু অক্সিজেন যদি পরিবেশে খুব বেশি হয়ে যায় তবেই সৃষ্টির আরও মারাত্মক সংকট। ঐ বর্ধিত অক্সিজেনের চাপে আমাদের শ্বসন হার প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে আর ফল হিসাবে আমরা পুড়ে ছাই হব।

পলবার্ট নামে বিজ্ঞানী দেখালেন প্রথম যখন অক্সিজেন বায়ুতে এল তখন জীবের পক্ষে তা ক্ষতিকর ছিল। বার্টের এই কথা বিজ্ঞানীরা মানলেন না। তারা যুক্তি দিলেন ডুবুরীরা বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে, আরও কত কি!

তবে একথা প্রমাণিত, কম অক্সিজেনে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হতে পারে কিন্তু বেশি অক্সিজেনে পরিণাম আরও অনেক ভয়াবহ। শুধু প্রাণীরা নয়, পৃথিবীর বিশাল বৃক্ষজগতও এই কথাকেই জানান দেয়।

1/8, গভঃ হাউসিং এস্টেট, সোদপুর, 24 পরগনা, 743178

জোর ধাক্কা

একটি ধাঁধা পেয়েছিলাম একবার। প্রথমে শুনেই মনে হয়েছিল বেশ বড়সড় একটা অঙ্ক নিয়ে বোধ হয় বসে পড়তে হবে। কিন্তু না, অঙ্ক যা ছিল তা সামান্যই শুধু শুধু বড় বড় সব সংখ্যা বলে ধাঁধিয়ে দেওয়া আর কি।

দুটি জেট আকাশে লড়ছে। স্পীডের হের ফের না করে একটি চলছে 8 কিলোমিটার বেগে, অন্যটি 12 কিলোমিটার বেগে। আর জেট দুটি দূর থেকে একই লাইনে ছুটে আসছে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি। সুতরাং ধাক্কা নির্ঘাৎ। ধরো এখন তাদের দূরত্ব 5000 কিলোমিটার। ধাক্কার এক মিনিট আগে তাদের মধ্যেকার দূরত্ব কত থাকবে ?

উত্তরটা কিন্তু চট করে বলা যায়। 20 কিলোমিটার। কারণ 20 কি. মি. দূর থেকে পরস্পরের মুখোমুখি এক মিনিট উড়লেই ওদের স্পীড অনুযায়ী (8+12) ধাক্কা লাগবে। সুতরাং এক মিনিট আগে দুটোর দূরত্ব 20 কি. মি.। আসলে ধাঁধিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ঐ 5000 কি. মি. দূর থেকে আসছে। ওটার কোন প্রয়োজনই নেই, যত দূর থেকে আসুক না কেন।

আর একটা বলি। শোনা গেল কলকাতায় একটা ভারী বোমা পড়বে আগামীকাল সকাল দশটায়। তাতে কলকাতা ধ্বংস। খবরটা একটা লোকের কানে এলো আজ দুপুর 12 টায়। লোকটা আধঘণ্টার মধ্যে আরো দুজনকে খবরটা জানিয়ে দিল। এখন তিনজন লোক খবরটা জানে। পরের আধঘণ্টা এরা প্রত্যেকে আরো দুজন করে লোককে বলল। আরো ছজন মিলে মোট খবর জানা লোকের সংখ্যা দাঁড়াল ন' জন। এইভাবে প্রতি আধ ঘণ্টায় আগের চেয়ে তিন গুণ লোক বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ 1, 3, 9, 27 ইত্যাদি। রাত আটটায় দেখা গেল শহরের সব লোক খবরটা জেনে গেছে। এখন আগের মত প্রশ্নটা হল শহরের এক-তৃতীয়াংশ লোক যখন খবরটা জেনে গেছে তখন রাত কটা ?

আশা করি এর উত্তর দিতে কোন অসুবিধাই নেই ? নিঃসন্দেহে রাত সাড়ে সাতটা। কারণ পরের আধ ঘণ্টায় এর তিনগুণ হয়ে সারা শহর। এখন তোমার বুদ্ধির ছোট্ট একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। সব কিছু হুবহু আগের মতই কেবলমাত্র দুপুর বারোটায় একজন নয় একসঙ্গে তিনজন লোক খবরটা প্রথম জানালো। এখন বলো সারা শহর জানাজানি হতে রাত কটা বাজবে ? তোমার উত্তরটা ঠিক হলো কিনা পরের সংখ্যায় মিলিয়ে নিও।

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

ক্যুইজ কনটেস্ট

গ্রেড I

VII-VIII মে 87

1. 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস' গ্রন্থের রচয়িতা কে ?
2. কোন্ কোন্ ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করতে সক্ষম ?
3. ভারত পৃথিবীর কোন্ গোলার্ধে অবস্থিত ?
4. সারা ভারতে কটি জাতীয় সড়ক আছে ?
5. দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার 'ব্রোকেন হিল' এ কোন্ ধাতুর খনি আছে ?
6. 'ওয়ার্লড কাপ' ফুটবল খেলা শুরু হয় কবে ?
7. 'পানিনি' কি জন্য বিখ্যাত ?
8. পৃথিবীতে 120 কিলোগ্রাম ওজনের একটি বস্তুকে চাঁদে নিয়ে গেলে সেখানে বস্তুটির ওজন কতো হবে ?
9. 'বসু সংখ্যায়ন' মেনে চলে যে সব মৌলিক কণা, তাদের কি নামে অভিহিত করা হয় ?
10. নিচের এইছবিটির নাম 'ভারত মাতা' এঁকেছেন এক বিখ্যাত বাঙ্গালী শিল্পী।—ঐ শিল্পীর নাম কি ?

গ্রেড II

IX-X মে 87

1. 'লোয়েস' কাকে বলে ?
2. 'নিজামুদ্দিন আউলিয়া' কে ছিলেন ?
3. 'ওদন্তপুরী' কিসের নাম ?
4. $\frac{1}{100}$ মিটারকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?
5. অধৌন জননএককের নাম কি ?
6. একাধিক বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দ মিলে যে মিশ্র শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে কি বলে ?
7. অ্যাসিডের মধ্যে কোন্ মৌল থাকা অপরিহার্য ?
8. 'আলাই দরওয়াজা' নামক প্রবেশদ্বার কে নির্মাণ করিয়েছিলেন ?
9. ভারতের জাতীয় পতাকার সবুজ রংটি কিসের প্রতীক ?
10. এই ছবিটি একজন প্রাক্তন বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের।—এঁর নাম কি ?

গ্রেড III

XI-XII মে 87

1. ভারতে 'Project Tiger' শুরু হয়েছিল কবে ?
2. 'ইভান লেণ্ডল' কোন্ দেশের নাগরিক এবং কি জন্য বিখ্যাত ?
3. 1987 সালের 'নেহরু গোল্ড কাপ' বিজয়ী দেশের নাম কি ?
4. ভারতের বৃহত্তম মিঠা জলের হ্রদের নাম কি ?
5. ধাতুদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু কোন্‌টি ?
6. একটি মুরগির ডিমে তা দিলে বাচ্ছা বের হয় কতো দিনে ?
7. শব্দ তরঙ্গ নিচের কোন্ মাধ্যমে দ্রুততম গতিতে চলে ? (ক) বায়ু (খ) জল (গ) ইস্পাত
8. 1882 খ্রীস্টাব্দে 'রিপন কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন কে ?
9. সরীসৃপদের স্বাভাবিক ইতিহাস পঠন-পাঠন বিদ্যার ইংরেজী নাম কি ?
10. রসায়ন বিজ্ঞানে এঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।—কে এই বিজ্ঞানী।

সংকেত—পাশাপাশি বিপুল আচার্য

1. কার্বনের যোজ্যতা 4 এর প্রথম আবিষ্কারক
2. আলকাতরা থেকে কৃত্রিম রঞ্জক 'অ্যানিলিন পার্পল' আবিষ্কার করেন যে বিজ্ঞানী।
5. Zn Co_3 যার রাসায়নিক সংকেত
8. পাইন গাছের একটি রেচন পদার্থ।
9. ঋণাত্মক ত্বরণের নাম।

সংকেত—উপরনিচ

1. দুধের প্রোটিনের নাম
3. একটি নীলাভ সবুজ শৈবাল।
4. জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয় যে মাছকে।
6. তিমির চলন অঙ্গের নাম।
7 উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়ক হর্মোন।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

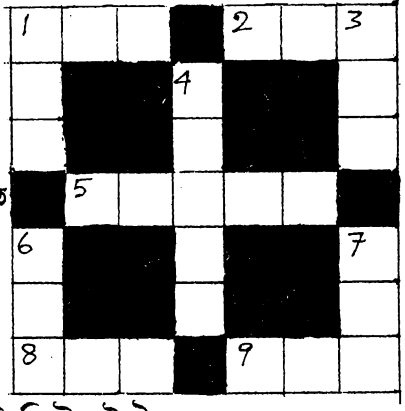

1			■	2		3
	■	■	4	■	■	
	■	■		■	■	
■	5					■
6	■	■		■	■	7
	■	■		■	■	
8			■	9		

আই কিউ টেস্ট / মে 1987

1. নিচের সংক্ষেপিত শব্দগুলির পুরো কথাগুলি কি ?
(a) N.C C., (b) H. H., (c) T. T. (d) K. K. K.

2. যদি তুমি তোমার বাড়ি থেকে পশ্চিমদিকে 15 মাইল যাও, তাহলে তুমি তোমার বাড়ি থেকে 1 মাইল দূরে অবস্থান করবে। আর, যদি তুমি তোমার বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে 3 মাইল যাও, তাহলে তুমি তোমার বাড়ি থেকে 17 মাইল দূরে অবস্থান করবে। তুমি এই মুহূর্তে তোমার বাড়ি থেকে কত দূরে অবস্থান করছ ?
(a) 14 মাইল পশ্চিম, (b) 14 মাইল পূর্ব,
(c) 20 মাইল পশ্চিম, (d) 20 মাইল পূর্ব।

3. কোনটির আপেক্ষিক তাপ বেশি ?
(a) বরফ, (b) লোহা, (c) মার্বেল, (d) নিকেল।

4. কোন ঘড়ি আবহাওয়ার প্রভাবকে উপেক্ষা করে নির্ভুল সময় দেয় ?
(a) সূর্য ঘড়ি, (b) জল ঘড়ি, (c) রিস্ট ওয়াচ, (d) ক্রনোমিটার।

5. টিনের একটি মাত্র আকরিক আছে, যার বাণিজ্যিক মূল্য যথেষ্ট। সেই আকরিকটির নাম কি ?
(a) ক্যাসিটেরাইট, (c) উইলেমাইট, (c) ফ্লোর অ্যাপাটাইট।

মার্চ 87 সিনিয়ার ক্যুইজ/কনটেস্ট-এর সমাধান

1. 1854 খ্রীস্টাব্দে, লর্ড ডালহৌসীর আমলে। 2. চার মিনিট। 3. ভারতে মহানদীর উপর নির্মিত হীরাকুঁদ বাঁধ। 4. রোধাঙ্কের একক। 5. সমযোজ্যতার। 6. অবতল লেন্স এর মতো। 7. ক্লোরোসিস। 8. আট সেকেণ্ড। 9. ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক থাকে। 10. (খ) 77°। 11. $\frac{1}{4}$ গুণ হবে। 12. তিনটি।

মার্চ সংখ্যার ফটো ক্যুইজের সমাধান : শ্লথ

মার্চ '87 জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান

1. 746 ওয়াট। 2. Oil and Natural Gas Commission. 3. সুবিধা বেশি হবে। 4. নিউটন। 5. সালফার, পটাসিয়াম নাইট্রেট, কাঠকয়লা চূর্ণ। 6. তিন পয়সা। 7. $1\frac{5}{6}$. 8. Fe_3O_4। 9. অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। 10. (গ) চাপ। 11. বেগুণী ও লাল। 12- (ক) উত্তল।

মার্চ সংখ্যার ফটো ক্যুইজের সমাধান : প্লাঙ্কটন

মার্চ '87 আই-কিউ-টেস্টএর সমাধান

1. (c) 130 ; ইংরাজী বর্ণমালার বর্ণগুলি বানান অনুযায়ী বসিয়ে যোগ করো, তাহলেই সংখ্যাটি পেয়ে যাবে।

2. 32 ; কারণ সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে—
$0^2 \times 2 = 0,\ 1^2 \times 2 = 1,\ 2^2 \times 2 = 8,\ 3^2 \times 2 = 18$
$4^2 \times 2 = 32$

3. অমৃতসর। কারণ অন্যগুলি মহাদেশ।

4. (b) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।

5. জি এস রাবধাওয়া, 1964 সালে।

শব্দকূট সমাধান

1 ফো	2 টে	ন	■	3 টো	4 নি	ং
■	নি	■	5 হি	■	ড়া	■
6 কা	ক	■	উ	■	7 নী	8 ল
ক	■	9 মো	রে	ন	■	ব
10 ন	11 ব	■	মি	■	12 ব	ণ
■	ড়	■	য়া	■	ল	■
13 ম	দি	না	■	14 মা	ন	ব

টেলিফোন

সকাল থেকে ফোনের পাশে গালে হাত দিয়ে চুপটি ক'রে বসে আছে জিজা। ঝিল্লী পিসীর ফোন আসবে বলে। বিকেলবেলায় সার্কাস দেখতে যাওয়ার কথা রাজাকাকু আর ঝিল্লী পিসীর সঙ্গে। এখন সাড়ে নটা বাজে—তাও কোন খবর নেই। জিজা বেচারীর মন তাই ভারী খারাপ।

বললাম 'গল্প শুনবি?' ওষুধে কাজ হল। জিজা নড়ে চড়ে বসে বলল 'বল'।

গল্প শুরু করলাম।

'আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল বলে একজন ভারী ভালো লোক ছিলেন। তিনিও তাঁর বাবা আর ঠাকুরদাদার মতো বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতেন—সেই সব বাচ্চাদের যারা কথা বলতে বা শুনতে পেত না। এমনই একটি ছোট মেয়ের জন্য তিনি একটি যন্ত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন যার সাহায্যে সে কানে শুনতে পাবে। এই যন্ত্র আবিষ্কার করতে করতেই টেলিফোন আবিষ্কার করেন বেল সাহেব।

1876 খ্রীস্টাব্দের 10ই মার্চ টেলিফোনের জন্মদিন। বেল সাহেব টেলিফোনে প্রথম যে কথাটা বলেন সেটা হল 'Mr. Watson, come here, I want you।' ওয়াটসন ছিলেন বেল সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় সহচর।

টেলিফোনের ট্রান্সমিটারে যখন কোন কথা গিয়ে পৌঁছায় তার আঘাত লাগে মাউথপীসের পেছনের একটা কার্বনের পর্দায়। পর্দা আর তার পেছনের পাতের মধ্যে কতগুলো কার্বনের দানা আছে—সেগুলো তখন নড়ে ওঠে। তাতে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং সেটা গিয়ে পৌঁছয় শ্রোতার টেলিফোনে। সেখানে ছোট্ট একটা চুম্বক আছে, সেটা একটা ধাতুর চাকতিকে নাড়ায়। আমরা তখনই কথা শুনতে পাই।'

ক্রীং ক্রীং ক্রীং···। আমার গল্প শেষ হবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। জিজার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল—এক লাফে টেলিফোনের রিসিভারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জিজা। গল্প শেষ হবার দিকে তার আর মন নেই।

অলয় ঘোষাল ও ঋতুপর্ণ ঘোষ

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

ছোটদের দপ্তরের নাম বদল করে বর্তমান সংখ্যা থেকে করা হল কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠকেরা অবশ্য এই নামটির সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত। প্রায় এক বছর আগে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে ঘনাদা ক্লাবের অধিবেশনে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা। এই পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নিয়েও আমরা অনেক আলোচনা করেছি। সর্বস্তরের মানুষের কাছে জ্ঞান বিজ্ঞানের সংবাদ পৌঁছে দেওয়া বিশেষতঃ কিশোর কিশোরীদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গঠনে সাহায্য করাই হবে এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। তাই বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে পরিষদের অন্যতম কর্মসূচী হবেঃ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প পাঠের আসর, জেলা-ভিত্তিক বিজ্ঞান আলোচনা ও মডেল প্রদর্শনী। ইতি মধ্যে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর শহরে পরিষদ একটি অনুষ্ঠান করেছে। এবার থেকে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রকাশিত যাবতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। তোমরা যারা কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিভিন্ন জেলায় সংগঠন গড়ে তুলতে চাও—তারা সরাসরি জয়ন্ত দত্ত পরিচালক, কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ এর সঙ্গে যোগাযোগ করবে ॥

সফল উত্তরদাতাদের নাম

সিনিয়র ফটো ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় সঠিক উত্তর আগে আসার ভিত্তিতে যে তিনজন পুরস্কৃত হবেঃ

1. সুদীপ ঘোষ, প্রযত্নে সুহৃদ ঘোষ, 109/1 জসলীন রোষ, লিচু বাগান, কাঁচড়া পাড়া, 743145। 2. বরুণ বিশ্বাস, প্রযত্নে, সূর্যকান্ত বিশ্বাস, গ্রাঃ+পোঃ-জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। 3. সৌতি দত্ত, প্রযত্নে, দিলীপ কুমার রায়, 23 শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কল-56।

সিনিয়র ফোটো ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় আরও সঠিক উত্তর দাতাঃ

কলকাতাঃ দেবজিৎ রায়, শান্তনু রায়, অভিজিৎ ঘোষ, সুব্রত ভাণ্ডারী, শবরী গুপ্ত, অনির্বাণ চ্যাটার্জী, বিশ্বজিৎ দাসগুপ্ত, অমল মজুমদার, দোলনচাঁপা দাসগুপ্ত, শুভব্রত মণ্ডল, স্নেহাংশু চট্টরাজ, সুদীপ দত্তবণিক, ইন্দ্রশ্রী জানা, দেবজিৎ চক্রবর্তী, সত্যব্রত ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ মণ্ডল, দীপ্তিরাণী সামন্ত, দেবদুলাল ভট্টাচার্য, নির্মল সোম, রাজীব গাংগুলী, অনিন্দ্য দাস, দেবাশিস চক্রবর্তী, কাজল ভট্টাচার্য, দেবাংশু দাস, সৈকত সরকার। **হাওড়াঃ** পার্থ ব্যানার্জী, মানসী পাত্র, রজত দে, সুদীপ রায়, পিন্টুকুমার শীল, সুভাশীষ পাত্র, শ্রীবণী হোড়, কৌশিক মল্লিক, সৈকত বিশ্বাস, সুব্রত গুছাইত, শেখ আসাদুল হক। **হুগলীঃ** অসীম কুমার সিংহ, সিদ্ধার্থ নিয়োগী, ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়, রজত দে, প্রিন্স দাসগুপ্ত অনির্বাণ দাসগুপ্ত, অজয় কুমার যশ, সুকান্ত খান, স্বরাট মুখোপাধ্যায়, শৈবাল মুখার্জী, অপালা ভট্টাচার্য, দেবাশীষ শেঠ, সঞ্জয় কর্মকার, সঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু মিত্র, ভাস্কর চ্যাটার্জী। **মেদিনীপুরঃ** অপূর্ব কুমার সামন্ত, সৌমেন রায়, অচিন্ত্য ঘোষ, অনুপকুমার দাস, সুমন্ত নারায়ণ দত্ত, সন্দীপকুমার মাহাতো, পুলিন বিহারী সাউ, কৃষ্ণা বিশ্বাস, সুব্রত রায়, দিলীপ দাস, শঙ্খপ্রতিম ভট্টাচার্য, দুর্লভ ব্যানার্জী। **বর্ধমানঃ** সুব্রত কুমার ঘোষ, উদয় শঙ্কর চ্যাটার্জী, সব্যসাচী গড়াই, অরূপ মুখোপাধ্যায়, অর্ণব মুখোপাধ্যায়, কে বিশ্বাস, রাতুল রঞ্জন গোস্বামী, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা উপাধ্যায়, অসীমা ব্যানার্জী, সুমন রায়, সোমনাথ সিনহা, সুখেন্দুবিকাশ চৌধুরি, বিভাস সোম, দেবমাল্য নিয়োগী, কান্তিরঞ্জন মাহাতো, কিংশুক রায়, শ্রীময়ী গুপ্ত, সোনালী বিশ্বাস, ধ্রুবজ্যোতি রায়, মঞ্জরী দত্ত, উমাপদ ঘোষ, জয়ন্ত দেবনাথ' শৃন্তি দাস, সুব্রত সাহা। **নদীয়াঃ** বিকাশ কোলে, বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ছন্দোময় মণ্ডল, পরাগরঞ্জন মণ্ডল, রত্না দত্ত, অজন্তা বিশ্বাস। **মুর্শিদাবাদঃ** চঞ্চল অধিকারী। **পঃ দিনাজপুরঃ** অপূর্বকুমার পাল, অসীম পাল, শুভঙ্কর ঘোষ। **কুচবিহারঃ** প্রলয় কান্তি ডাকুয়া। **জলপাইগুড়িঃ** সঞ্জয় কুমার সরকার। **বীরভূমঃ** কৌশিক চ্যাটার্জী, পূর্বালী হালদার, মহম্মদ জামালাউদ্দিন, প্রণব কুমার রায়। **বাঁকুড়াঃ** সুব্রত কুমার পাত্র, দেবীদাস সাহানা, বিপ্লব কুমার লোহার, সাধন কুমার বীর, দেবমালা দে, অমিতাভ চৌধুরী। **পুরুলিয়াঃ** উত্তম কুমার কর্মকার। **24-পরগনাঃ** সৌমেন ভৌমিক, শাশ্বত ভট্টাচার্য, মেঘনাদ রায়, সুজয় কুমার বিশ্বাস, পলাশ কুমার বড়াল, মিঠু ঘোষ, রাণা ভট্টাচার্য, সঞ্জিত চ্যাটার্জী, সৌম চক্রবর্তী, সুব্রত চৌধুরী, রুনু নিয়োগী, মুকুল সর্দার, মধুমিতা চক্রবর্তী, জয়িতা মজুমদার, অতনু দাসগুপ্ত, সন্দীপ চক্রবর্তী, অভিরূপ মুখার্জী, অমিত ঘোষ, সোমনাথ বল। **মালদহঃ** অভিজিৎ কর্মকার, সঞ্জীব রায়, সমীরণ দেবনাথ, সমীরণ ঝা।

আই কিউ টেস্টের সবকটি উত্তর সঠিক ও আগে আসার ভিত্তিতে যে দশ জন সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. **কৌশিক মল্লিক**, প্রযত্নে, এস এন্ মল্লিক (মডার্ন কাট), পোঃ গ্রাম-বাগনান, জেলা-হাওড়া। 2. **অসীমকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে, অতুলকৃষ্ণ দাস, 17/1/5A কালীপদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-8। . **সব্যসাচী ভট্টাচার্য**, প্রযত্নে সমীর নাথ ভট্টাচার্য, 19/1 আর এন টি রোড, পোঃ-গ্রাম-হরিনাভি, 24-পরগনা। 4. **অচ্যুত কুমার দাঁ**, প্রযত্নে অসিত কুমার দাঁ, নিউ টোব্যাকো কোম্পানী, পোঃ-কামারহাটি, কলকাতা-58। 5. **শুভাশিস সরকার**, প্রযত্নে, ভরতচন্দ্র সরকার, উলুবেড়িয়া স্টেশন রোড, হাওড়া। 6. **মহুয়া ঘোষ**, প্রযত্নে পি এস ঘোষ, 1/1B রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-54। 7. **চম্পক অধিকারী**, c/o চন্দন অধিকারী, গ্রাম-চুয়াপুর, পোঃ-বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। 8. **সুব্রতেশ রায়**, c/o সুধীর কুমার রায়, পোঃ খড়্গপুর, মেদিনীপুর। 9. **সৈকত বিশ্বাস**, c/o, এইচ কে বিশ্বাস, 4/1, রেলওয়ে কোয়াটার, বালীঘাট পোঃ-বালী, হাওড়া-711201। 10. **অভিজিৎ সরকার**, c/o, অমলেন্দু সরকার, সুভাষপল্লী, পোঃ-খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

মার্চ '87জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এ সঠিক উত্তর দিয়ে আগে আসার ভিত্তিতে যারা পুরস্কার পাবে ঃ

প্রথম ঃ তন্ময় পাল, c/o, অমলকৃষ্ণ পাল, 603, পোঃ-বুড়োশিবতলা চুঁচুড়া, হুগলী। **দ্বিতীয় ঃ** দেবলা ব্যানার্জী, E/4/1 করুণাময়ী হাউসিং এস্টেট সল্টলেক সিটি, কলকাতা-91। **তৃতীয় ঃ** ধীরাজ তেওয়ারী (VIII), ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা-নদীয়া-741249।

মার্চ '87 এ জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ অনির্বাণ দাস, শ্রীমন্ত চৌধুরী, তন্ময় মহাপাত্র ; **24-পরগনা ঃ** গঙ্গাধর দাস, নিবেদিতা দত্ত, সীমন্তী মিত্র, সুব্রত মাইতি, সুমন ঘোষ, মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী, রুমা সিংহ, রূপম ভৌমিক, শুভ্র মুখার্জী, ইন্দ্রনাথ মল্লিক, দেবাংশু পুরকায়স্থ, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, জাহাঙ্গীর আলম শেখ ; **হাওড়া ঃ** শাশ্বতী সেন। **হুগলী ঃ** তন্ময় মণ্ডল, রাখী ব্যানার্জী, শুভ্রদীপ দাস ; **বর্ধমান ঃ** গার্গী পানি; সংহিতা দাস, অনিরুদ্ধ রায়, তমালী সাহা, প্রসেনজিৎ দাঁ, কৌশিক রায়, স্বাতী সাহা, অভিজিৎ গোস্বামী ; **মেদিনীপুর ঃ** ধীমান চক্রবর্তী, সুমন মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত দত্ত মজুমদার, মৌসুমী ঘোষ, মৃণালকান্তি কুণ্ডু ; **নদীয়া ঃ** অভ্যুদয় মণ্ডল, **বীরভূম ঃ** রূপা রায়, শিবব্রত ঘোষ, আলোক কুমার চক্রবর্তী ; **বাঁকুড়া ঃ** বর্ণালী কুচল্যাণ ; **মালদহ ঃ** মানসী হাজরা চৌধুরী, ইন্দ্রনীল কর্মকার ; **পঃ দিনাজপুর ঃ** অভিজিৎ সাহা, শিবশঙ্কর মজুমদার।

মার্চ '87-এ জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এ সফল উত্তর প্রদানের জন্য (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. তন্ময় মহাপাত্র, 56/F, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা-10। 2. শ্রীকুমার দে, প্রযত্নে, হরিনারায়ণ ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনী, পোস্ট-নবপল্লী বারাসত, উত্তর 24-পরগণা। 3. বরুণ চৌধুরী, 1, হরিপদ দাস লেন, কল-75।

মার্চ '87-এ জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এ আরও সফল উত্তর দাতা

কলকাতা ঃ কল্লোল ভদ্র, বিপ্লব গাঙ্গুলী, দেবলা ব্যানার্জী, কৃষ্ণস্মরণ জানা, অনির্বাণ সান্যাল, অর্চনা পাল ; **24-পরগণা ঃ** শুচিস্মিত ঘোষ, ইন্দ্রনাথ মল্লিক, এম. সোয়েব আলী, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুবীর চৌধুরী ; **হুগলী ঃ** রাখী ব্যানার্জী,

আরও নাম 61 পৃষ্ঠায়

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে, 87 সংখ্যা থেকে ক্যুইজ কনটেস্ট তিনটি পর্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। VII VIII; IX ও XI-XII।

ফটো ক্যুইজ আলাদা ভাবে থাকছে না।

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে যথারীতি 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

মে সংখ্যার কুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড—1

অমরনাথ রায়ের সায়েন্স্ এক্স-পেরিমেণ্ট

গ্রেড—2

অরূপরতন ভট্টাচার্যের যুক্তি তর্ক হেয়ালি

গ্রেড—3

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছোঃমজার গল্প

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—গ্রেড-1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..... .....

ঠিকানা ....

বয়স..... শ্রেণী .....

বিদ্যালয়ের নাম..... .....

আই কিউ টেস্ট/ক্যুইজ কনটেস্ট 1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তর পাঠালাম।

ফায়ার এলার্ম / ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

আজকাল প্রায়ই ঘরে ঘরে আগুন লাগে। সব সময় টেরও পাওয়া যায় না। ফলে মানুষ মারা পড়ে। তাই ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে আমরা এমন একটি মজার যন্ত্র বানাবো যা আমাদের খুব কাজে আসবে। তার আগে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ কিনে নাও :

1. Out Put (T_2) Transformer একটি
2. Transistor AC 128 একটি
3. Capacitor—·22μF „
   —·04μF „
4. Resistor—2·2kΩ „
   12k—100kΩ „ (যে কোন)
5. Speaker—8Ω „
6. Starter—টিউবলাইটের „

প্রথমে স্টার্টারটা খুলে তার ভেতর থেকে বাল্বের মত অংশটিকে খুলে নাও। এর কাচটিকে ভেঙে ফেল ও খেয়াল রেখো ভেতরের ধাতুর পাত দুটি যেন কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এবার বাকি কাজটা চিত্র মিলিয়ে সম্পন্ন কর। স্টারটারে বাল্বের ধাতুর পাত দুটির দিকে খেয়াল করতে হবে যে তারা যেন লেগে না থাকে বা তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেন 1-2 মিমি অপেক্ষা বেশি না হয়। ফাঁকটা যত কম হবে

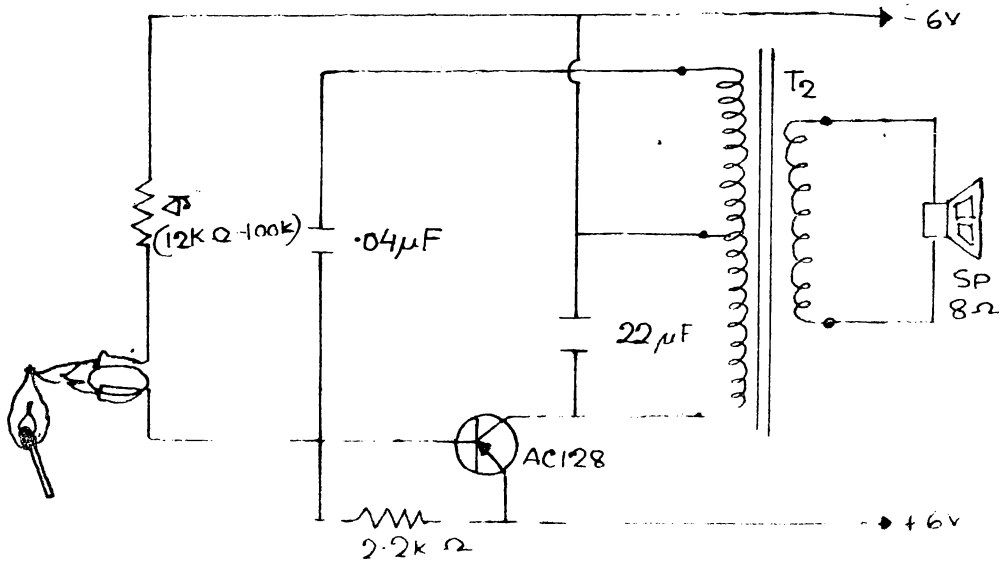

তত ভাল হবে এবং বেলও বেশীক্ষণ বাজবে।

সব কানেকশন হয়ে গেলে ব্যাটারি সংযোগ কর এবং বাল্বটির ধাতব পাত দুটিতে দেশলাই কাঠি বা মোমবাতি দিয়ে আগুন ধর, দেখবে সাইরেন বাজছে। এবার বাল্বটিকে রান্নাঘরে বা যেখানে আগুন লাগার সম্ভাবনা সেখানে রেখে দাও।

বিশেষ দ্রষ্টব্য রেজিস্টার 12kΩ 100kΩ পর্যন্ত যে কোন রেজিস্টর লাগাতে পার। তাতে সুরের বদল হবে সাইরেনে।

14 নং রায়নগর পার্ক, বাঁশদ্রোণী, 24 পরগনা 743501

(আরও উত্তর দাতাদের নাম ৫০ পৃষ্ঠার পর) শুভ্রদীপ দাস ; **বর্ধমান** : জীতেশ রায়, স্বাতী সাহা, অশোক মজুমদার, সঞ্জীব বিশ্বাস, অনিরুদ্ধ রায়, সুহানি বেগম ; **মেদিনীপুর** : অরূপ দাশ।

মার্চ '87-এ সিনিয়র ফোটো কুইজ কনটেস্ট-এ সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে : 1. জয়ন্ত ধর, 15, উমাচরণ মিত্র লেন, কলকাতা-3। 2. কৌশিক ব্যাগচি, প্রযত্নে, অনিতা চক্রবর্তী, 26/1 ভার্নার লেন, বেলঘরিয়া, কলকাতা-56। 3. অনুপম বসু সরকার, প্রযত্নে, অম্লানকান্তি বসু সরকার, পোস্ট-মগরা, হুগলী।

মার্চ 87-এ সিনিয়র কুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে : **হুগলী** : সুতপা মণ্ডল ; **বর্ধমান** : মৌমিতা দাশশর্মা, দেবরাজ ব্যানার্জী, দেবজ্যোতি পানি, অশোক কুমার নন্দী ; **মেদিনীপুর** : চৈতালী কুণ্ডু, সুজিত কুমার সাহা, মণ্ডমণি ঘটক ; **বীরভূম** : সুদীপ্ত ঘোষ।

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এর নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

- বিদ্যালয়পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়।
- পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় অনুযায়ী শব্দসংখ্যা হওয়া প্রয়োজন।
- রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে প্রেরিত রচনাটি অমনোনীত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য 4·00 টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা 40 00 টাকা। হাতে বই নিলে গ্রাহক চাঁদা 35·00 টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। Under Certificate of Posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রি ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত 50·00 টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।
- 25 কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা 25 টাকা।
- ভি. পি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হয়। সংখ্যাপিছু গ্রাহকদের 1·00 টাকা করে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে।

86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9

জলে চলে ব্লেড

অপরাজিত বসু

জলের উপরে ব্লেড চলতে দেখেছ? নিশ্চয়ই না। দেখ, কিভাবে জলের উপর ভাসমান ব্লেড ঘুরে বেড়ায়।

এক গামলা জল নাও। জল যেন পরিষ্কার হয়, নোংরা ঘোলা হলে চলবে না, বেশ টলটলে স্বচ্ছ জল হতে হবে। একখানা নতুন ব্লেড নিয়ে তার প্রান্তে ছোট্ট এক টুকরো সাবান লাগিয়ে দাও, তারপর সাবধানে তাকে জলের উপর ভাসিয়ে দাও। ব্লেডটাকে আলতো করে ধরে এমন ভাবে জলের উপর ছাড়তে হবে যাতে ব্লেডের এক পিঠ এক সঙ্গে জলকে স্পর্শ করে. নচেৎ জলের মধ্যে ব্লেডটা ডুবে যাবে!

জলের উপর ব্লেড ছাড়ার পর দেখ, কেমন ধীরে ধীরে জলের উপর দিয়ে ব্লেডটা ভেসে বেড়াচ্ছে। ব্লেডের যে দিকে সাবানের টুকরো লাগানো আছে, তার বিপরীত দিকে ব্লেডটা এগিয়ে চলেছে!

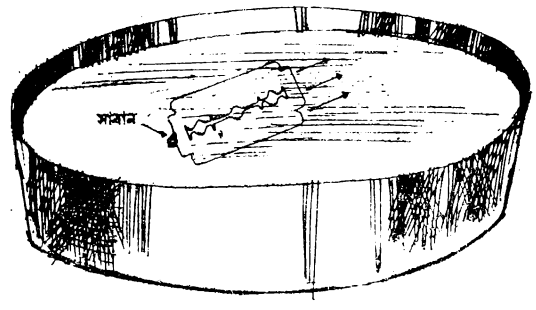

কি করে হলো? তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সকল তরল পদার্থের (জল সমেত) তলের একটা টান আছে, যার নাম 'পৃষ্ঠটান'। পৃষ্ঠটানের জন্য জলের তলকে পর্দার মতো আচরণ করতে হয়। সাবানের টুকরো জলের যেখানে ছুঁয়ে আছে, যেখানে দ্রবীভূত সাবান জলের পৃষ্ঠটান কমিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ব্লেডের বিপরীত দিকের জলের পৃষ্ঠটান বেশি থাকার জন্য ব্লেডটা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্লেডের দু প্রান্তে পৃষ্ঠটানের পার্থক্য হওয়ার দরুন. বেশি পৃষ্ঠটানের তল ব্লেডকে টেনে আনছে, তাই জলের উপর লোহার তৈরি ব্লেডকে ভাসতে ও চলতে দেখছি।

তোমরাও এই মজার পরীক্ষাটা চেষ্টা করে দেখ, নিশ্চয়ই পারবে।

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

প্রশ্নোত্তর বিভাগের নাম পাল্টে 'বলতে পারো কেন' করা হয়েছে—এ খবর তো তোমরা আগের সংখ্যাতেই জানতে পেরেছ। এবং 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগের জনপ্রিয়তা যে প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে চলেছে—তা দপ্তরে আসা চিঠির পরিমাণ থেকেই আমরা বুঝতে পারছি। তবে এতদিন শুধু তোমরাই আমাকে প্রশ্ন করেছ—আর আমি চেষ্টা করেছি সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার। কিন্তু এখন থেকে আমিও তোমাদের একটি দুটি প্রশ্ন করব যা ছাপা হবে 'নির্বাচিত প্রশ্ন' নামে। এই সব প্রশ্ন অবশ্য তোমাদের প্রশ্ন থেকেও বেছে নিতে পারি। তোমরা যাতে বিজ্ঞানের প্রতি অনুসন্ধিৎসু ও আগ্রহী হয়ে উঠতে পারো সেইভাবে প্রশ্ন সাজানো হবে। এর উত্তর আমার কাছে পাঠাবার দরকার নেই। কারণ উত্তর তো পরের সংখ্যাতেই ছাপা হবে। তোমরা যারা জানতে না—তারা তো খুশী হবেই, আর যারা জানো—তারাও একবার চোখ বুলিয়ে নিতে আপত্তি কি ?—সুধাংশু পাত্র

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন

এয়ার পকেট কী এবং কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন অনিরুদ্ধ রায়—নতুনগঞ্জ, বর্ধমান থেকে।

প্রঃ ক্যানসার রোগটির কারণ কী এবং এর প্রতিষেধক কি কোন দিন আবিষ্কৃত হবে না ? মোহনলাল চক্রবর্তী, বৈদ্যডাঙা-রসুলপুর, বর্ধমান।

মোহন, তোমার বাবা উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে চিঠিখানা লিখেছো। তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা আমাদের নেই। তবু বলছি, শরীরের কোথাও (বাইরে অথবা দেহাভ্যন্তরস্থ গলনালী, পাকস্থলী, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, রক্ত ইত্যাদিতে) যদি অস্বাভাবিকভাবে কোষ বৃদ্ধি ঘটে তাহলে সেখানে শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। কোষবৃদ্ধি প্রথমে টিউমারের আকার প্রাপ্ত হয় তারপর রূপান্তরিত হয় ক্যানসারে। পরিশেষে দেহময় ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর মৃত্যু ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় যদি ধরা পড়ে তাহলে অপারেশন ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে রোগ নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগটি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে না।

সাম্প্রতিক গবেষণাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ক্যানসারের মূলে আছে কোষ মধ্যস্থিত কয়েক প্রকার জিন। জিনরা ডি. এন. এ অণুর পাশে সুতার মত জড়িয়ে থাকে এবং প্রতিটি কোষে থাকে সংখ্যায় প্রায় এক লক্ষের মত। ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোন রাসায়নিক পদার্থ (যেমন ধূমপায়ীদের বেলায় নিকোটিন) ও কদাচিৎ কোন ভাইরাস কোষ মধ্যস্থিত ডি. এন. এ-র উপর যদি আক্রমণ চালায় তাহলে কিছু কিছু জিন ক্যানসার সৃষ্টির মাধ্যমে পরিণত হয়। প্রায় ১৫টিরও বেশি মাধ্যম বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন। এক একটি মাধ্যম এক এক ধরনের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক ধরনের ক্যানসার সৃষ্টি করে।

মাধ্যমরা কোষে সৃষ্টি হয়ে অচল অবস্থায় থাকলে ক্যানসারের সম্ভাবনা নেই। সক্রিয় হয়ে সচল হলেই সর্বনাশ। এদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শরীর অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। পান-জর্দা, বিড়ি-সিগারেট, মদ গাঁজা ইত্যাদি সেবনে; বিষাক্ত কীটনাশক প্রভৃতির পরিবেশে বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রভৃতির প্রভাবে শরীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারায় এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোষ বাড়তে শুরু করে।

অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধির মত ওর প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমান বছরের শেষের দিকে মেলবোর্ন এর গবেষকদের গবেষণাবলীকে অবলম্বন করে জাপান মাত্র তিন রকমের ক্যানসারের প্রতিষেধক সরবরাহ করতে পারবে বলে জানিয়েছে। আর বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল মনে করছেন, 1995 সালের দিকে তাঁরা ক্যানসারকে জয় করবেন। তবু যতক্ষণ মানুষ হাতের কাছে না পাচ্ছে ততক্ষণ ওর ভয়াবহতা দূর হবে না।

মোহনের ব্যথা-ভরা চিঠি প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। মাদ্রাজে এক দরিদ্র কেরানীর ঘরের একটি ছেলে 'স্প্রু' রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সেকালে 'স্প্রু' রোগের কোন প্রতিষেধক ছিল না। তার মৃত্যুতে প্রচণ্ডভাবে ব্যথা পেলেন তারই এক কিশোর ভাই। খুব করে কান্নাকাটি করলেন। অবশেষে প্রতিজ্ঞা করলেন 'স্প্রু' রোগটাকে তিনি পৃথিবী ছাড়া করবেনই।

ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবার সামর্থ্য পিতার ছিল না। তবু কিশোরটি তাঁর প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হলো না এক চুলও।

এক রকম ভিক্ষে করেই তিনি পড়াশোনা চালিয়েছিলেন এবং ডাক্তারও হয়েছিলেন। কিন্তু স্প্রু রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে বুঝলেন, ভারতে থাকলে কিছুতেই সম্ভব হবে না। অগত্যা এক সামান্য বৃত্তিকে অবলম্বন করে তিনি লণ্ডনে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল পড়াশোনা করার পর বুঝতে পারলেন, তাঁর উদ্দেশ্য এখানেও সিদ্ধ হবে না। অতঃপর বাধ্য হয়ে তিনি কপর্দকহীন অবস্থায় পাড়ি দিলেন নিউইয়র্কে এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রথমে হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক আর্দালীর কাজ গ্রহণ করেন। পরে আপন অধ্যবসায়ের বলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী এবং তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মার্কিন সরকার তাঁকে নিয়োগ করেন নিউইয়র্কের "আমেরিকান সায়নামাইড" প্রতিষ্ঠানের গবেষণা শাখার সহ অধিকর্তার পদে। পরে অধিকর্তাও হয়েছিলেন। তিনি কেবল 'স্প্রু' রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে জগতের বহু ভ্রাতাকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন নি, শত শত ওষুধ ও অ্যাণ্টিবায়োটিক আবিষ্কার করে বিশ্বের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন। পেলেগ্রার প্রতিষেধকও তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর একটি ওষুধ আজও তাঁর নামকে বহন করে চলেছে। ওষুধটির নাম সুবামাইসিন। আর সেদিনের সেই শোকগ্রস্ত তরুণটির নাম ইয়েল্লাপ্রাগদা সুব্বা রাও। পরিচিত হয়েছিলেন "আশ্চর্য ওষুধ সমূহের আবিষ্কারক অত্যাশ্চর্য মানুষ।" 1948 সালে মাত্র 52 বছর বয়সে নিউইয়র্কেই পরলোকগমন করেছেন।

তোমরা কী সুব্বা রাও এর মত প্রতিজ্ঞা করতে পার না, বিশ্বের পিতা, মাতা, ভাইবোনদের রক্ষা করবে ক্যানসারের হাত থেকে?

ক্যানসার সম্বন্ধে প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আর যারা রেখেছেন, তারা যথাক্রমে সঞ্জয় চৌধুরী—ভারতী রোড-দুর্গাপুর-5; তপনজ্যোতি দাস—রাজবাড়ী-ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা; অমর সিদ্দিকী—গীতগ্রাম, মুর্শিদাবাদ; নবেন্দু মণ্ডল—ঈশ্বরচন্দ্রপুর নদীয়া।

প্রঃ আমরা ঘুমানোর সময় স্বপ্ন দেখি কেন? প্রশান্ত মিশ্র—কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর; বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়—রামকৃষ্ণ রোড, বোলপুর; উদয় প্রতাপ প্রামাণিক—ফরাক্কা ব্যারেজ মুর্শিদাবাদ; অপূর্ব সামন্ত—সিপাই বাজার, মেদিনীপুর।

উঃ স্বপ্ন দেখার অনেক কারণ আছে। সাধারণভাবে বলা হয় যে, আমরা নানা রকমের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম করে থাকি। আবার মাঝে মাঝে এমন সব কল্পনা করি যে, বাস্তবে অনেক সময় সফল হয় না। সেগুলি অবচেতন মনে স্থান পায়। ঘুমানো তথা পূর্ণ বিশ্রামের সময় মন সেগুলো পর্যালোচনা করে এবং অনেক সময় বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে বলে মনে হয়।

প্রঃ এইডস্ রোগটি কী? রোগটির কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে জানতে চাই। প্রেমাশিস ভট্টাচার্য—মহেশ্বরপুর, বহরকুলি, বর্ধমান; কৃষ্ণা বিশ্বাস—দুর্গাচক, হলদিয়া মেদিনীপুর; জয়কুমার দে—মিস্ত্রীপাড়া, বোনপাস বর্ধমান; সেখ্ আসাদুল হক—গোয়ালবেড়িয়া, বাগনান, হাওড়া।

উঃ বর্তমানে এইডস্ রোগটি একটি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো নাম "অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম" বা AIDS। এটি ভাইরাস ঘটিত রোগ এবং ভাইরাসটির নাম 'হিউমেন টি-সেল লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস —টাইপ থ্রি' তথা HTLV—3। নামকরণ করেছেন প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক রবার্ট সি. গ্যালো 1984 সালে।

গবেষকদের বিশ্বাস, উক্ত ভাইরাসের পোষক আফ্রিকার এক জাতীয় নীল বানর। আফ্রিকার অধিবাসীরাও ওর মাংস খায়। তাই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ঐ রোগ দীর্ঘকালের। তানজানিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা, হাইতি প্রভৃতি অঞ্চলে ওর ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। হাইতি থেকে প্রথম বহন করে এনেছে মার্কিনরা। তারপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর অপরাপর দেশে। তবে আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মার্কিনরা। তারপর ফ্রান্স, জার্মানী ও কানাডার অধিবাসী। ভারতবর্ষে বিদেশীদের আগমন যেখানে বেশি সেই মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে আক্রান্তদের সংখ্যাও বেশি। কলিকাতায় এ পর্যন্ত মাত্র একজনের দেহেই পাওয়া গেছে ভাইরাসটিকে।

উক্ত ভাইরাস একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এমনও দেখা গেছে, হাসপাতালে ইনজেকশন দেওয়ার সূচের মাধ্যমেও এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। রোগটির প্রধান লক্ষণ (1) পেটের গোলমাল আসে ও পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে। (2) প্রতি এক সপ্তাহ অন্তর পর্যায়ক্রমে জ্বর হয় ও সুস্থ থাকে। (3) শুকনো কাশি হয়। (4) বগল ও কুঁচকি ফুলে উঠে। (5) রাত্রে ঘাম ঝরে। (6) মুখ ও দাঁতের উপর কালো কালো দাগ পড়ে এবং নখ ও চুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।

রোগটি সংক্রামক এবং এই রোগে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। সহসা রোগী মারাও যায়। রোগটির প্রকৃত প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি বলা চলে। তবে AZT নামক ওষুধটি বিশেষ ফলপ্রদ। বিজ্ঞানীরা চলতি বছরের শেষের দিকে প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রঃ মাথা ধরে কেন? বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়—রামকৃষ্ণ রোড, বোলপুর, বীরভূম।

উঃ আমাদের শরীরে সব সময় যে সব সূক্ষ্ম ও জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া চলছে তা ঠিক মত সম্পন্ন না হলে আমরা নানা প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। মাথা ধরাটা তেমনই এক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ। বাইরের কতকগুলি

ব্যাপার—তথা বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, লোডশেডিং, মিছিল, জনতার ভীড়, নানা ধরনের দুশ্চিন্তা ইত্যাদি যেমন মাথাধরার কারণ তেমনই চোখের দোষ, অজীর্ণ, রক্তবহা নালীগুলির দেওয়াল সঙ্কুচিত হওয়া ইত্যাদি রোগের উপসর্গও। মাথা ধরলে বাজারের মাথা ধরার ওষুধ কিনে খাওয়াটা ভয়ানক বিপজ্জনক। ওতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রক্তের লোহিত কণিকার হ্রাস পায় এবং হৃৎপিণ্ডের রোগ আসে। মাথা ধরলে কিছুক্ষণ পূর্ণ বিশ্রাম নাও। যদি না ছাড়ে তাহলে ডাক্তারের কাছে যাও।

প্রঃ শীতকালের সকালে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার হয় কেন? বিশ্বনাথ সরকার, অমলেশ বালা ও সঞ্জয় টিকাদার, বগুলা নদীয়া; সুখেন্দু, জগদ্দল 24 পরগনা; সমীর, চন্দ্রকোণা রোড, মেদিনীপুর; পুলিনবিহারী সাউ, ইন্দা, খড়্গপুর।

উঃ মুখ থেকে নির্গত জলীয় বাষ্প বাইরের ঠাণ্ডার সংস্পর্শে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণাকে অবলম্বন করে জমে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। তখন মনে হয় যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

প্রঃ উত্তর দিকে মাথা করে ঘুমোতে নেই কেন? সমীরণ পাল ও শুভময় ঘোষ, দরবস্তীবালা মেদিনীপুর; অপূর্ব সেন, আঁতরসী, মেদিনীপুর।

উঃ এটি একটি সংস্কার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রঃ শনিগ্রহের বলয় সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো অভিজিৎ সাহা ও শিবশঙ্কর মজুমদার—গঙ্গারামপুর, পঃ দিনাজপুর থেকে; ভট্টাচার্য গার্ডেন রোড, নবগ্রাম শ্রীরামপুর থেকে সুমনা রায় জানতে চেয়েছো—চাল থেকে মুড়ি কী ধরনের পরিবর্তন? * প্লাস্টিক সার্জারীর কথা জানতে চেয়েছো সুদীপ্ত সেনগুপ্ত রামপুর হাট বীরভূম, থেকে * অচিন্ত্য বিশ্বাস জানতে চেয়েছো উঁচুতে পাখি উড়তে থাকলে কেন মাটিতে ছায়া পড়ে না—চাঁদের ঘাট নদীয়া থেকে * ইলেকট্রনের কক্ষপথের কথা জানতে চেয়েছো শ্রীদাম সরকার বগুলা উচ্চ বিদ্যালয়—নদীয়া থেকে; * আকু পাংচার সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছো শুভঙ্কর ঘোষ, চালকোলা পঃ দিনাজপুর থেকে * হলোগ্রাফী সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো হাইলাকান্দি চাচর আসাম থেকে অরিন্দম ভট্টাচার্য এবং সাঁইথিয়া বীরভূম থেকে চন্দন মুখোপাধ্যায়; * পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান কেন জন্মগ্রহণ করে জানতে চেয়েছো রঘুনাথপুর পুরুলিয়া থেকে নাণ্টু রজক এবং চন্দনপুর নদীয়া থেকে মনিরুল ইসলাম।

উঃ মাত্র কিছু দিনের ব্যবধানেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে, তোমরা একটু কষ্ট করে পুরাতন সংখ্যা-গুলি থেকে উত্তর জেনে নাও।

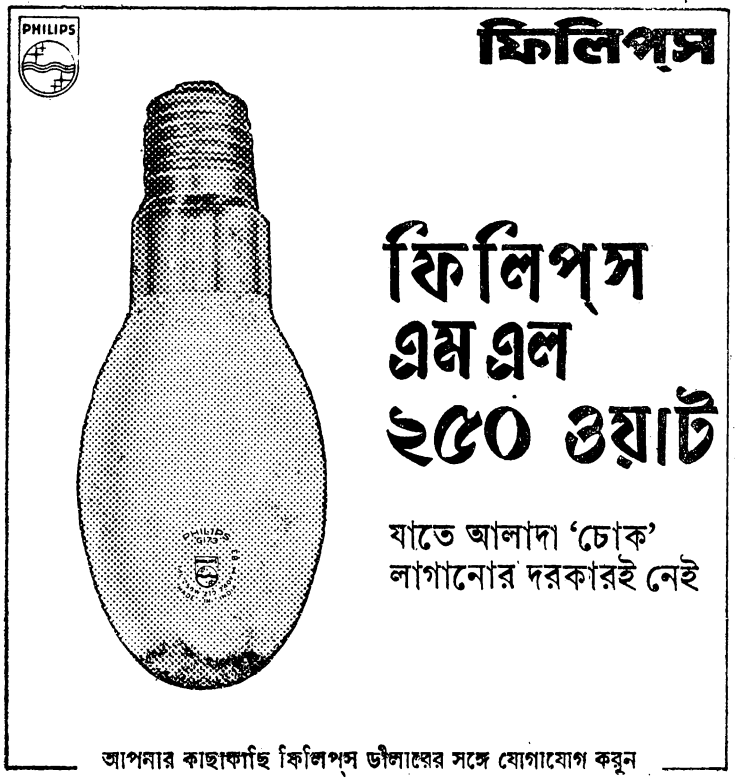

বিজ্ঞানের খবর

আর্থাইটিসের নতুন চিকিৎসা

আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসায় হিলিয়াম-নিওন লেসার ব্যবহারের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজাখ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের একদল বিজ্ঞানী। এটা মূলতঃ সম্ভব

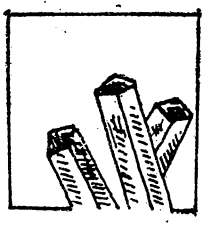

হয়েছে লেসার বিকিরণের প্রদাহরোধী (anti inflamatory) ধর্মের জন্যই। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে গাঁটে আর্থ্রাইটিস জনিত প্রদাহ শুরু হয়েছে সেখানে নিয়ন্ত্রিত ভাবে স্বল্পমাত্রায় হিলিয়াম—নিওন-লেসার প্রয়োগ করলে আক্রান্ত কোষে বিশেষ কিছু জীবরাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়, ফলে প্রদাহ জনিত যন্ত্রণাও কমে তাৎক্ষণিকভাবে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিকে দাঁত, চামড়া ও ফুসফুসের বিভিন্ন প্রদাহ জনিত অসুখে ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিশদ গবেষণা শুরু করেছেন।

নতুন ফসিল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম কানসাস অঞ্চল থেকে সম্প্রতি বেশ কিছু ফসিল উদ্ধার করেছেন জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা। ধারণা করা হচ্ছে—এগুলি এক কোটি বছরেরও পুরনো। প্রায় ত্রিশটি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রায় পঞ্চাশটি প্রজাতির জীবজন্তুর জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অতীতে কানসাসের তাপমাত্রা ছিল উষ্ণতর এবং বৃষ্টিপাতও ছিল প্রচুর প্রায় আজকের আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমির মতই।

বিপন্ন গাছপালা

ইনটারনেশনল ফর ইউনিয়ন কনসারভেশন অফ নেচার (International union for Conservation of Nature)-এর সূত্রে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ—বর্তমানে গোটা দুনিয়ার কমবেশি ৫০ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব বিপন্ন! বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা উদ্ভিদের প্রায় 25 শতাংশের দ্রুত

নিঃশেষ হওয়ার কারণ হিসেবে ব্যাপক হারে অরণ্য নিধনকেই দায়ী করেছেন বিজ্ঞানীরা। অথচ এইসব লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির অনেকগুলিই যথেষ্ট ভেষজ গুণ সম্পন্ন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ইনটারনেশনল ইউনিয়ন ফর কনসারভেশন অফ নেচার, ওয়ার্লড লাইফ ফাণ্ড এবং ইউনাইটেড নেশনস্ ফুড অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন যৌথভাবে এক আবেদন রেখেছেন দুনিয়ার সমস্ত বোটানিক্যাল গার্ডেনগুলির কাছে। তাঁদের আবেদন—প্রত্যেকটি বোটানিক্যাল গার্ডেন যেন বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে—পৃথিবীর মোট 200 বোটানিক্যাল গার্ডেনগুলির মধ্যে মাত্র 40 শতাংশ নিয়মিতভাবে সংরক্ষণের কাজ করছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের আশা, বাকিরাও যদি এই কর্মসূচীতে সামিল হন, সেক্ষেত্রে বহু বিপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি অদূর ভবিষ্যতে টিকে যেতে পারে।

নতুন বস্তুকণা

নতুন একটি বস্তু কণার খোঁজে গোটা দুনিয়ার বিজ্ঞানী মহলে গবেষণার কাজ এখন চরম পর্যায়ে। এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ঐ বস্তুকণার নাম দেওয়া হয়েছে হিগ্‌স্ বোসন (Higgs Boson)—এডিনবরার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নামানুসারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা—বস্তুর ওজন বৃদ্ধি এবং তার ভরের জন্য এই বস্তুকণাই দায়ী। বিশ্বে যতরকম শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, তাঁর সবকটিকে একটি কাঠামোর মধ্যে আনার ব্যাপারে এটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সেদিক থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমনকি প্রাণসৃষ্টির ব্যাখ্যাতেও এই হিগ্‌স্ বোসনের আবিষ্কার একান্ত জরুরী।

এই বস্তুকণার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিরাট অর্থব্যয় করতেও প্রস্তুত। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যে একটি পারটিকল্ কোলাইডার (Particle Callider) তৈরির জন্য 400 কোটি ডলার খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের বহু দেশও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই।

অমিত চক্রবর্তী

বিজ্ঞান বিভাগ, আকাশবাণী, কলিকাতা

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স** ১৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **চারমূর্তি ১০**
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **রামধনু ১০**
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গুপীগাইন বাঘাবাইন ৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদার জুড়ি নেই ১০**
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **কম্বল নিরুদ্দেশ ৮**
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের মজার গল্প ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ১০**
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **ঝাউবাংলোর রহস্য ৭**
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

ঘনাদা কাহিনীর নতুন চমক !

মৌলিক কাহিনী সার বিপণন সংস্থা ঘনাদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে— গল্পের প্লট সাপ্লাই করবে ঘনাদা কিভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫

জীবনচরিতমালা

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি
প্রণীত জীবন চরিতমালা
প্রতি খণ্ড দশ টাকা

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ॥ পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ কৃতী বিজ্ঞানী
মেঘনাদ ॥ বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র
কৃতী বিজ্ঞানী সি· ভি· রমন
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
পরমাপ্রকৃতি সারদামনি
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
আলোকময়ী শ্রীম

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **ভৌতিক গল্প ১০**
আনন্দ বাগচি ॥ **মুখোশের মুখ ৮**
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রহস্য গল্প ১০**
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রোমাঞ্চ গল্প ১০**
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর গোয়েন্দা গল্প ১০**
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **মোহনপুরের শ্মশান ৬**
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥**শেরিংহত্যা রহস্য ১০**
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যক্ষপতির রত্নপুরী ৬**
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যখের আসন ১০**

সম্প্রতি প্রকাশিত

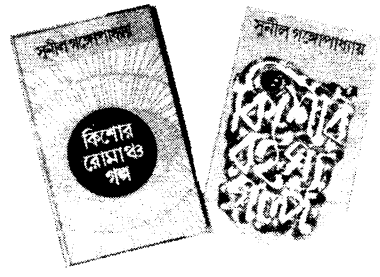

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কিশোর রহস্য গল্প

কিশোর রোমাঞ্চ গল্প

প্রতিটি দশ টাকা

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

অমিতাভ চক্রবর্তী **ছোটদের বাঘের গল্প ৮**
কেনেথ আন্ডারসন
শিবানীপল্লীর কালো চিতা ২০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ **বনে জঙ্গলে ১৫**
অজয় হোম ॥ **বিচিত্র জীবজন্তু ১২**
কেনেথ অআন্ডারসন
মানুষখেকোর বিভীষিকা ১৫

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ **বাঙলার গাছপালা ১৫**
প্রেমেন্দ্র মিত্র॥ **মেজো কর্তার ভৌতিক গল্প ১৫**
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ **শেকসপীয়ারের গল্প ১০**
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়॥ **ছোটদের মজার গল্প ১০**
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়॥ **সবার প্রিয় টেনিদা ১০**

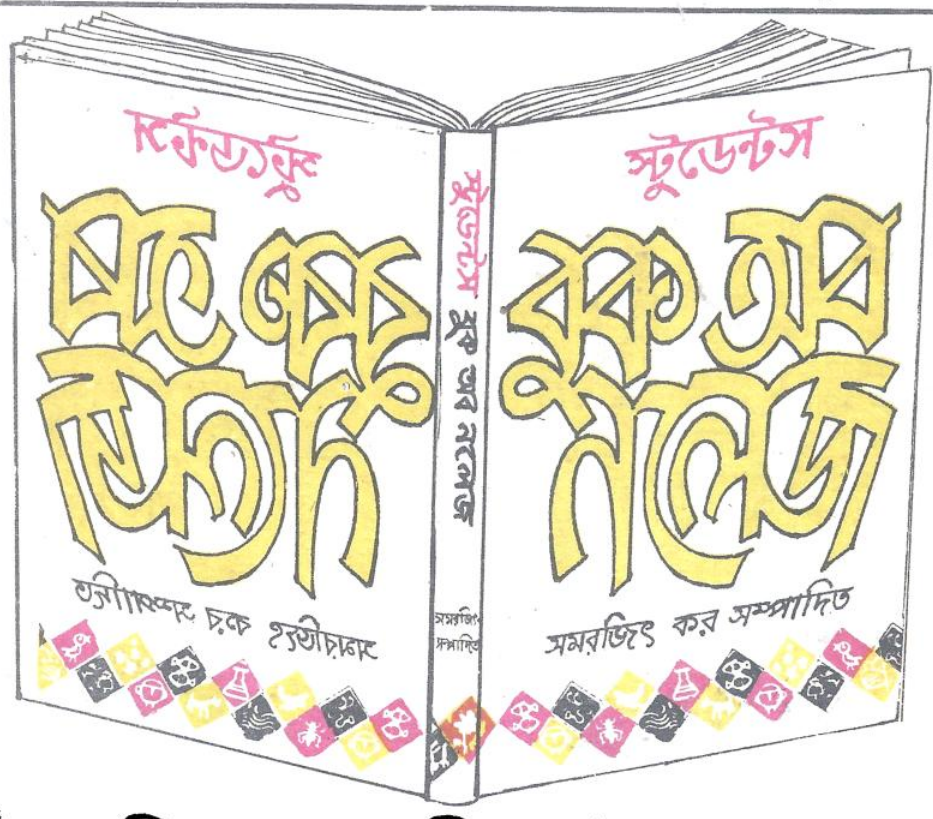

দুটি অতি প্রয়োজনীয় বই

'অণু' শব্দের অর্থ কি ? পরমাণুই বা কাকে বলে ? আজকের দিনের স্কুলের ছেলেমেয়েদের অজানা নয় । কিন্তু অক্টেন স শব্দটির অর্থ আমরা সবাই জানি কি ? ভিনিগার নানারকম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে ব্যবহার হয় । কিন্তু ভিনিগার যে একরকমের অ্যাসিড এ তথ্য আমাদের অনেকেরই অজানা । ম্যাগ্রোমিটার ও ম্যানোমিটার শব্দদুটি আজকাল আমরা প্রায়ই শুনতে পাই । কিন্তু শব্দদুটির সঠিক ব্যবহার কি ? বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও অনেক শব্দ আমরা শুনতে পাই—যার প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানি না । এইরকম প্রায় ২৫০০ শব্দের চিত্রসহ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রচনা করেছেন প্রবীণ বিজ্ঞান লেখক অমরনাথ রায় । যে গ্রন্থ শুধু কিশোর কিশোরীদেরই নয়, অনেক বয়স্ক পাঠকেরও কৌতূহল মেটাবে । পঁচিশ টাকা

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
অমরনাথ রায় সঙ্কলিত

স্টুডেন্টস সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

আপনার ছেলেমেয়েদের
আরও জানার কৌতূহল
মেটাবে

একখণ্ডে সম্পূর্ণ

সমরজিৎ কর সম্পাদিত

স্টুডেন্টস

পঞ্চাশ টাকা

ছোটদের বইয়ের স্বপ্ন রাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কল-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২

দাম : 4·00 টাকা।